স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৬ষ্ঠ বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৭

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ
ডা. জয়ন্ত দাস

সম্পাদকমণ্ডলী
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে,
গোপাল সরকার,
দুনিয়া গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু
বিনিময় ২০ টাকা

প্রকাশক
গোপাল সরকার
***স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র** তরফে
দাসপাড়া (আংশিক), পূর্ব বুড়িখালি, বাউরিয়া
উলুবেড়িয়া,
হাওড়া ৭১১৩১০

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন: ৪০৬৪-৪০৯৭/৪১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

কিউবার মেডিক্যাল মিশন
মেডিক্যাল আন্তর্জাতিকতা: যা কোনো সীমান্তের বাধা মানে না; মেডিক্যাল বায়োটেকনোলজি গবেষণায় কর্পোরেট মুনাফাবাজির বিকল্প; অহেতু গাদাগুচ্ছের টেস্ট না-করে কেবল ইতিহাস জেনেই আশি শতাংশ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা যায়—জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে এসব কিছু নিয়ে কিউবা বিশ্বে দিশারির ভূমিকা নিয়েছে—জানাচ্ছেন ডন ফিৎজ। ৫

ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন
ডায়াবেটিস রোগটা এমন যে শরীরের কোনো অঙ্গকেই সে রেহাই দেয় না। যদি নিয়ন্ত্রণ না করা যায় তবে এ রোগে পায়ে ঘা হতে পারে, পা কেটে বাদ দিতেও হতে পারে! কিন্তু ব্লাড সুগার ঠিক রাখার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিছু সাধারণ যত্ন নিলে পা-কে অক্ষত রাখা সম্ভব—লিখেছেন ডা. নিবেদিতা। ১৩

বুকের ব্যথার ব্যাবসা
নিত্য নতুন প্রযুক্তির চিকিৎসা আসছে হার্টের রোগ সারাতে, হার্ট অ্যাটাক আটকাতে। তাতে রোগীর টাকা খসছে বিস্তর। কেউ কেউ উপকার পাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু অনেকেই রোগ সারানোর বদলে পয়সা খরচ করে নতুন ঝামেলা ডেকে আনছেন। আপনার সমস্যায় নতুন প্রযুক্তি ভালো করবে নাকি মন্দ, জানাচ্ছেন ডা. গৌতম মিস্ত্রী। ১৬

টাক পড়ার চিকিৎসা
সব টাকেই চুল ওঠে বটে, কিন্তু সবার টাক একই ধরণের নয়, তার চিকিৎসাও আলাদা হতে পারে। সাধারণ টাক বা অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া-র চেনার উপায় আর চিকিৎসার পথ নিয়ে লিখেছেন **ডা. জয়ন্ত দাস।** ৩৮

এ কালের নার্সিসাস ও সেলফি
রাস্তাঘাটে সিনেমা রেস্তোঁরায় সেলফি তুলে সাত-তাড়াতাড়ি ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট না করলে ঘুম হয় না? সেলফি তুলতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট? হঠাৎ গজানো এই ফ্যাড নিয়ে গভীরে লিখেছেন মনোবিদ রুমঝুম ভট্টাচার্য। ৪১

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত লেখা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়। এইসব লেখা পড়ে কেউ নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করবেন না, করলে সেই চিকিৎসার ফলে যে অসুবিধা বা বিপদ ঘটতে পারে, তার দায় সম্পূর্ণভাবেই সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সেজন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

কিউবার মেডিক্যাল মিশন: ডন ফিৎজ ৫

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিরোধ: ডা. অপূর্ব ১০

ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন: ডা. নিবেদিতা ১৩

বুকের ব্যথার ব্যাবসা: ডা. গৌতম মিস্ত্রী ১৬

অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা ক্ষয়জনিত হাঁটুর ব্যথা: ডা. মৃন্ময় ২৩

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তাকে মনে রেখে মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন ২৭

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে: প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ২৮

ফ্যান্টম (ভূতুরে) অঙ্গের ব্যথা ও আয়না থেরাপি: ডা. বিপ্লব ৩১

সাপ কামড়ের সমস্যা: ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদার ৩৪

টাক পড়ার চিকিৎসা: ডা. জয়ন্ত দাস ৩৮

এ কালের নার্সিসাস ও সেলফি: রুমঝুম ভট্টাচার্য ৪১

সীমান্ত জীবন: পর্ব ১: ডা. মৃন্ময় ৪৩

রক্তবীজ: সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৪৫

টুকরো খবর

এই ক্যান্সার চিকিৎসায় শরীর নিজেই নিজের ঘাতক হয়ে উঠছে ৫০

প্রচার

শব্দ দিয়ে জব্দ করার কৌশল মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে: বিজ্ঞান অন্বেষক ৫১

বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থাপত্রের দাবি: বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যবৃন্দ, আলিপুরদুয়ার জংশন ৫১

বইপড়া

সাপের কামড় ও তার প্রতিকার: জয়ন্ত দাস ৫২

চিঠি ১ ৫৩

চিঠি ২ ৫৪

চিঠি ৩ ৫৫

চিঠি ৪ ৫৫

শব্দছক: প্রস্তুতি: রুচিরা মজুমদার ৫৬

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান

কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল

পাতিরাম
বুকমার্ক
পিপলস বুক সোসাইটি
বই-চিত্র
মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট

কলকাতার অন্যত্র

অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ)
এস কে বুকস (উল্টোডাঙা)
লেখনী, ২/৪৬ নাকতলা, কলকাতা ৭০০০৪৭,
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়)
বইকল্প (ঢাকুরিয়া)
দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি (উত্তর কলকাতা)
জ্ঞানের আলো (যাদবপুর, কলকাতা-৩২)

কলকাতার বাইরে

শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল)
ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ)
পুষ্প নিউজ এজেন্সি (মালদহ, ফোন ৯৯৩২৯৬৭৯৯১)
জাতিস্মর ভারতী (জলপাইগুড়ি, ফোন ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮)
প্রয়াস মল্লভূম (লোকপুর, বাঁকুড়া, ফোন ৯৪৩৪২২৭৪৯৯)
মাধব পেপার স্টল, (বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড, ফোন ৯৯৩২৪৫৫২৪৪)
প্রদীপন গাঙ্গুলি (দার্জিলিং, ফোন ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২)
আনন্দম (মাথাভাঙা, বরুণ সাহা, ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮, ৯৭৩৩১১৬৪৪২
সোমা দত্ত (হাওড়া, ফোন ৯১৪৩২৪৫৯৩৭)
যুক্তিবাদী সমিতি (বাগনান, ফোন ৯৮৩০৬০৩০২৯)
যুক্তিবাদী সমিতি (রাধানগর শাখা, বাঁকুড়া ৯৪৭৪৫৬৫০৪৭)

শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বই-এর স্টলে।

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন:
৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭

পত্রিকা পাওয়ার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: ৯৮৩০৮৮৬৪৪১, ৯৪৭৭০২৮১৫৭

ইমেল: swasthyerbritte@gmail.com

***স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র গ্রাহক হোন।**

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬টি সংখ্যার জন্য ১৮০ টাকা।

Swasthyer Britto-র নামে চেক বা ড্রাফট পাঠান এই ঠিকানায়-
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর ৩, কলকাতা ৭০০ ০৯৭
আউটস্টেশন চেকে ৩০ টাকা আরও যোগ করুন

অথবা

NEFT-র মাধ্যমে টাকা পাঠান এই অ্যাকাউন্টে
Swasthyer Britto
A/c No.0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code: CNRB0000315

সেদিনই NEFT Transaction Id ও গ্রাহকের নাম, ফোন বা SMS করে জানান এই নম্বরে ৯৮৩০৮৮৬৪৪১

সম্পাদকীয়

ফিদেল কাস্ত্রো ও কিউবার স্বাস্থ্যব্যবস্থা

ফিদেল কাস্ত্রো গত হয়েছেন ২০১৫-র নভেম্বরে। তাঁকে নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে। লিখতে হচ্ছে, কেননা স্বাস্থ্য কেবল ব্যক্তিগত বিষয় নয়, তা সামাজিক। এবং অবশ্যই রাজনৈতিকও।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘোষিত শত্রুর প্রশংসা করা ঝুঁকির ব্যাপার, বিশেষ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র মতো আন্তর্জাতিক কিন্তু আমেরিকা-নির্ভর সংগঠনের প্রধানের পক্ষে। কিন্তু ২০১৬-র মার্চ মাসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল মার্গারেট চ্যান কিউবার প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি। তাঁর মূল কথাটা ছিল, কিউবার উন্নয়নে স্বাস্থ্যকে একটা স্তম্ভ হিসেবেই দেখা হয়েছে। যে কথাটা তিনি বলেননি, বললে হয়তো খারাপ শোনাত, সে কথাটা হল, অন্য দেশ সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে বোঝে আর্থিক উন্নয়ন, অর্থাৎ সে দেশের মোট ধনসম্পদ বৃদ্ধির কথাই ভাবা হয়, আর সেই ধনের বেশির ভাগটাই থাকে অল্প কয়েকজনের হাতে। সেই উন্নয়নে জনগণের স্বাস্থ্য সরকারের কাছে এক 'অনুৎপাদক খাত' উপদ্রব-মাত্র, আর বেসরকারি পুঁজির কাছে মুনাফা কামানোর একটা ক্ষেত্র।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাস্ত্রোর মূল পথ ছিল রোগ হবার আগে তাকে আটকানো। এই পথের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্তত কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু মেডিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির প্রতাপ এমন প্রবল যে বিভিন্ন দেশের নানা সরকার মুখে যাই বলুক শেষমেশ বড়ো হাসপাতাল স্পেশালিটি-সুপারস্পেশালিটির কর্পোরেটপোষিত গ্ল্যামারের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

কিউবায় প্রতিটি অঞ্চলের জন্য একজন ডাক্তার সেখানেই থাকেন আর তিনি প্রত্যেক অধিবাসীকে চেনেন, তাদের রোগের ইতিহাস জানেন। প্রত্যেক বাচ্চা টিকা নিচ্ছে কিনা, প্রতিটি গর্ভবতী মহিলা মাসে মাসে পরীক্ষা করাচ্ছেন কিনা, যাঁদের ক্রনিক রোগ আছে তাঁরা ঠিকঠাক চিকিৎসা করছেন কিনা, এসবই সেই ডাক্তার দেখেন। অঞ্চলের কেউ হাসপাতালে ভর্তি হলে তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে হাসপাতালের ডাক্তারদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন এই ডাক্তার।

কিউবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো কেবল রোগের চিকিৎসা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয় তাই নয়, একটি বসতিতে কী কী স্বাস্থ্যমর্যাদা আছে তা খুঁজে বের করে ও যথোচিত পদক্ষেপ নেয়। যেমন কোথাও হয়তো একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ধূমপানের সমস্যা দূর করা চেষ্টা করে, আবার অন্য একটি কেন্দ্র স্থানীয় মানুষের অতিরিক্ত অ্যালার্জির কারণ খোঁজে ও তার প্রতিবিধান করে। ব্যক্তিগত স্তরে চিকিৎসায় এরকম কাজ অনেক বেশি শক্ত। ফললাভের সম্ভাবনাও কম।

এইভাবে কিউবান ডাক্তারদের কাছে মানুষের সমস্যার সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণগুলো অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর সে ব্যাপারে কার্যকর কিছু করতে তাঁরা অনেক বেশি সক্ষম হন। এটি মার্কিন-প্রভাবিত চিকিৎসা সংস্কৃতির চাইতে একেবারে অন্যরকম। মার্গারেট চ্যান বলেই ফেলেছেন, 'রোগ হলে সারানোর চিকিৎসা-ভাবনা অনেক বেশি অদক্ষ ও অপচয়ী।" যেমন আমেরিকায় মানুষ স্বাস্থ্যখাতে তাদের মোট জাতীয় আয়ের ১৭.১ শতাংশ খরচ করতে বাধ্য হন, আর কিউবার মাথাকিছু জাতীয় আয় অনেক কম, তদুপরি তারা জাতীয় আয়ের মাত্র ৮.৮ শতাংশ স্বাস্থ্যখাতে খরচ করে। অথচ আমেরিকার তুলনায় কিউবা কোনো স্বাস্থ্য-সূচকেই পিছিয়ে নেই, উপরন্তু সাদা-কালো, শহর-শহরতলির স্বাস্থ্যের মধ্যে বৈষম্য কিউবায় অনেক কম, শিশুমৃত্যুর হারও কম।

আমেরিকা কিউবাকে অর্থনৈতিক অবরোধে ফেলেছিল, ফলে উন্নত চিকিৎসার ওষুধ ও কৃৎকৌশল সে দেশে পৌঁছোচ্ছিল না। কিউবাকে নিজের ওষুধ শিল্প নিজেকেই গড়তে হয়। আজ কিউবা ওষুধ রপ্তানি করে। অন্যদিকে, নানা দেশে, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে, কিউবান মেডিক্যাল মিশন অনেক জীবন বাঁচিয়েছে। আর 'উন্নত' দেশগুলোর পেশাদার দামি ডাক্তার-নার্সদের তুলনায় কিউবান মেডিক্যাল মিশন কম খরচে কাজ করে, বেশি ঝুঁকির কাজে পেছপা হয় না, আর সেখানকার স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ইতিবাচক মূল্যবোধ আনতে চেষ্টা করে—কিন্তু দুর্দশার সুযোগ নিয়ে সেই দেশে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে না। যেমন ২০০৪ সালে সারা লাতিন আমেরিকা জুড়ে কিউবান মেডিক্যাল মিশন অজস্র ছানি অপারেশন করেছে, সেখানে সে-দেশগুলোর সরকারের নীতি বা চরিত্র বিচার করা হয়নি। সম্প্রতি ২০১৪-তে পশ্চিম আফ্রিকায় এবোলা ভাইরাস আক্রান্ত দেশগুলোতে কিউবা কয়েকশো ডাক্তার ও নার্স পাঠিয়েছে।

তাহলে কি কিউবার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই? না, তা নয়, এমন কল্পস্বর্গ কেবল কল্পনাতেই থাকে। আমরা কি সব দেশেই কিউবান মডেল অনুসরণ করব? না, তাও নয়, কিউবা এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে তার স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়েছে। কিন্তু কিউবার থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া যায়। আর্থিক ক্ষমতা নির্বিশেষে স্বাস্থ্যের অধিকার বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা, স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাণের যোগ স্থাপন করা, রোগ প্রতিরোধের ওপর জোর দেওয়া, আর সারা পৃথিবীর মানুষের কথা ভাবা—এই হল কিউবার স্বাস্থ্যব্যবস্থার শিক্ষা।

আর সেজন্যই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* ফিদেল কাস্ত্রোকে স্মরণ না করে পারে না।

কিউবার মেডিক্যাল মিশন

ডন ফিৎজ

মেডিক্যাল আন্তর্জাতিকতা: সীমান্তের বাধা না-মানা স্বাস্থ্য সুরক্ষা—এক অভিনব ধারণা। কিউবার স্বাস্থ্যমন্ত্রক, ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা শত বাধাবিপত্তির মধ্যেও এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করে চলেছেন লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশে দেশে। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মী পাঠিয়ে, প্রশিক্ষণ দিয়ে অন্য দেশগুলোকে স্বাস্থ্যরক্ষায় স্বনির্ভর করে তুলতে তাঁরা অবিরাম প্রয়াসী। মেডিক্যাল বায়োটেকনোলজির গবেষণায় তাঁরা নিত্য নতুন দিক উন্মোচিত করছেন; কর্পোরেট ওষুধ কোম্পানিগুলোর মুনাফাবাজির পালটা সস্তায় ওষুধ সরবরাহ করছেন। এ-সবই বিশদে আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে। এটি *বাংলা মান্থলি রিভিয়ু* (সেপ্টেম্বর ২০১৬)-তে প্রকাশিত নিবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।

২০১৪-র শেষে পশ্চিম আফ্রিকায় যখন ইবোলা ভাইরাস ছড়াতে শুরু করে তখন বিশ্বের অনেক দেশ-ই ভয়ে কুঁকড়ে যায়। অচিরেই ২০,০০০-এর বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়, ৮০০০-এর বেশি মানুষ মারা যায়, এবং আশঙ্কা হতে থাকে যে মৃত্যুর হার শীঘ্রই দশ লাখ ছুঁয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সংকট মোকাবিলায় মদত দিতে সেনাবাহিনীর জোগান দেয় আর অন্যান্য দেশ দেয় আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। কিউবাই প্রথম দেশ যারা এগিয়ে আসে সব থেকে প্রয়োজনীয় সংস্থানটি নিয়ে। কিউবা ১০ জন স্বাস্থ্যকর্মী, ৬২ জন ডাক্তার-স্বেচ্ছাকর্মী সিয়েরা লিওনে পাঠায়। আফ্রিকায় আগে থেকেই ৪০০০ স্বাস্থ্যকর্মী (যাদের মধ্যে ২৪০০ জন ডাক্তার) ছিলেন। তাই সংকট শুরুর আগেই কিউবা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি ছিল। সিয়েরা লিওনে সংকটের আগে থেকেই দুই ডজন কিউবান চিকিৎসাকর্মী কাজ করছিলেন। একটি প্রাথমিক সমীক্ষার পরে কিউবা আরও ২৯৬ জন স্বাস্থ্যকর্মীকে গিনি এবং লাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। যেহেতু অনেক সরকারেরই জানা ছিল না কীভাবে ইবোলার মোকাবিলা করা যায় তাই কিউবা হাভানার পেড্রো কোউরি ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ নানা দেশ থেকে আগত স্বেচ্ছাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। সব মিলিয়ে কিউবা ১৩,০০০ আফ্রিকান, ৬৬,০০০ লাতিন আমেরিকান এবং ৬২০ জন ক্যারিবিয়ানকে প্রশিক্ষিত করে—কীভাবে ইবোলায় আক্রান্ত না হয়েও এর চিকিৎসা করা যায়। এই সময়েই অনেকে প্রথম কিউবার আপৎকালীন পরিষেবা দলের কথা শোনে।

জন কার্ক তাঁর নতুন বই *Health Care without Borders: Understanding Cuban Medical Internationalism* ('সীমান্তহীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা: কিউবার আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনীতির বোঝাপড়া')-এ যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন, এই ইবোলার অভিজ্ঞতা তার মধ্যে মাত্র একটি। ২০০৯ সালে প্রকাশিত তাঁরই আরেকটি বই Cuban Medical Internationalism: Origins, Evolution and Goals ('কিউবান আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনীতি; উৎস, বিকাশ এবং উদ্দেশ্য'), যার যৌথ লেখক ছিলেন মাইকেল এরিসমান, সেটি থেকে এই বইটির লক্ষ্য অনেকটাই ভিন্ন। ওই বইটি ছিল বিশ্বজুড়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে কিউবার যে যোগদান তার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য রূপরেখা আঁকা। Health Care Without Boarders আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সহযোগিতার বিশ্বরাজনীতির উপর বিশেষ জোর দিয়ে সম্প্রসারিত স্বাস্থ্য কর্মসূচির সাম্প্রতিকতম তথ্যাবলির জোগান দিতে পেরেছে।

আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল পলিসির বিকাশসাধনে কিউবার সামনে মস্ত বড়ো দীর্ঘস্থায়ী বাধা, অন্যান্য বহুদেশের মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনগুলো এবং তাদের সরকারের এর প্রতি বিদ্বেষমূলক শত্রুতা পোষণ। যাদের নাটের গুরু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। একজন সাইকোলজিস্ট হিসেবে আমি 'অবজ্ঞা অভিক্ষেপ' (neglect projection) শব্দবন্ধটি ব্যবহার করি কিউবার মানবতাবাদীদের উপর আসা অসংখ্য আঘাতকে একজোট করতে। 'অভিক্ষেপ' শব্দটি সেইসব ব্যক্তিদের বর্ণনা করে যারা নিজেদের অগ্রহণীয় চিন্তাভাবনা বা আবেগকে অন্যের উপর আরোপ করে। রাজনৈতিক অভিক্ষেপ বলতে বুঝি একটি দেশ যখন নিজেদের নিন্দনীয় কার্যকলাপ অন্য সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়। কিউবার বিরুদ্ধে মেডিক্যাল 'অবজ্ঞা অভিক্ষেপ' বিভিন্ন রূপ নেয়। এর মধ্যেই বিভিন্ন লাতিন আমেরিকান দেশের মেডিক্যাল সংগঠনগুলো কিউবান ডাক্তারদের উপর গভীর বিদ্বেষ

উদ্‌গার করে ফেলেছে; তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাঁরা দেশের নিজস্ব ডাক্তারদের চাকরি কেড়ে নিচ্ছেন; কিউবান ডাক্তারদের অন্য দেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য কেবল প্রচারের ঢক্কানিনাদ চালানো; তাদের মেডিক্যাল-শিক্ষার মান খারাপ আর যথোপযুক্তভাবে অনুবর্তী পরিষেবাও তারা দিতে পারে না।

ব্রাজিল বা ভেনেজুয়েলায় ডাক্তারদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ধোপে টেকে না কারণ কিউবার চিকিৎসা-কর্মীরা যান গ্রামাঞ্চলে, গরিবদের চিকিৎসা করতে—যেখানে সেসব দেশের স্থানীয় চিকিৎসকেরা পা-ও মাড়ান না। শাভেজ সরকারই প্রথম ২০০৩ সালে 'বারিও আদেন্ত্র' (পাড়াপড়শির ভিতর) কর্মসূচি চালু করে ভেনেজুয়েলার গরিব, শ্রমিক শ্রেণি-অধ্যুষিত জেলাগুলোর জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার ওষুধ সরবরাহ করতে থাকে। ভেনেজুয়েলান ডাক্তারদের যোগ দিতে আহ্বান করা হলে মাত্র ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। এটা এতটাই হতাশাজনক ছিল যে কিউবা ৯০০০-এরও বেশি নিজস্ব চিকিৎসাকর্মীকে সেই বছরের মধ্যেই নিয়োগ করে। বারিও আদেন্ত্র শুরু হওয়ার পর ভেনেজুয়েলান ফেডারেশন অফ মেডিসিন (ফ ম ভ) কিউবান ডাক্তারদের বহিষ্কারের দাবি তোলে, অংশত এই অভিযোগে যে তাঁরা বামপন্থী প্রচার চালাচ্ছেন। তবে কিউবার ডাক্তারদের 'ফ ম ভ'-এর মতো কোনো চড়া রাজনৈতিক রং ছিল না। তাঁদের এইভাবেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল যে, যে দেশেই তাঁরা পরিষেবা দিতে যান, তাঁদের রাজনীতি নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাবেন না। এটা না করলে যেদেশে ডানপন্থী সরকার বা ডানপন্থী ডাক্তার গোষ্ঠী রয়েছে, ভেনেজুয়েলার মতো নয়, তাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যচুক্তিতে অহেতুক জটিলতা তৈরি হয়।

কোস্তারিকা এবং চিলির মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনগুলোর অভিযোগ ছিল যে, কিউবায় যারা ডাক্তারি পড়ে সেই সমস্ত ছাত্রদের যোগ্যতানির্ধারক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর কম। কিউবার মেডিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থা যে দুঃস্থ গ্রামীণ এলাকায় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য রক্ষা, পারিবারিক চিকিৎসা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি, এ-ব্যবস্থার পুরো নজর যে এইসব বিষয়েরই উপর—ওই ছেঁদো অভিযোগগুলো এমন অনবদ্য চিকিৎসা-ব্যবস্থার গুরুত্বটাকেই খেলো করে দিতে চায়। কার্কের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে কিউবান ডাক্তাররা প্রায়শই তাঁদের ছাত্রদের কাছে একটি প্রশ্ন করে থাকেন, 'আমাজনের মাঝখানে, যেখানে কোনো রোগ নির্ণায়ক ব্যবস্থা নেই, সেখানে তোমরা রোগ নির্ণয় করতে কী করবে এবং কীভাবে করবে?' কিউবান ডাক্তাররা বিশদ ইতিহাস এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমেই ৮০ শতাংশেরও বেশি চিকিৎসা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। যেহেতু কিউবান ডাক্তাররা শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসূচকের বৃদ্ধিতে অনেক বেশি সফল তাই কিউবান ছাত্ররা অন্য দেশের পরীক্ষায় কত নম্বর পাবে তার থেকে বেশি প্রাসঙ্গিক হল এটা জানা যে কোস্টারিকা বা চিলির চিকিৎসা-শিক্ষাকেন্দ্র থেকে উত্তীর্ণ স্নাতকরা কিউবার পরীক্ষায় কেমন ফল করবে।

তীব্র আক্রোশে কিউবার ডাক্তারদের দিকে সম্ভবত জঘন্যতম অভিযোগের তির ছুঁড়ে মারা হয়েছিল—বারিয়ো আদেন্ত্র-তে নাকি অপথাল্‌মলজিস্টরা অপারেশন পরবর্তী জটিলতা এড়িয়ে, রোগীকে ঝুঁকি মধ্যে ফেলে রেখে উধাও হয়ে যান। এটা ডাহা মিথ্যে কথা। সত্যিটা হল, কিউবার ডাক্তাররা দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর রোগীদের পরিচর্যায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের থেকে অনেক বেশি সময় দেন। যখন কিউবার ডাক্তাররা বাড়ি ফিরে যান, দ্বীপের অন্য অপথাল্‌মলজিস্টরা এসে তাদের জায়গা পূরণ করেন।

কিউবান ডাক্তাররা বিশদ ইতিহাস এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমেই ৮০ শতাংশেরও বেশি চিকিৎসা সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন।

অন্যান্য মূল 'অবজ্ঞা অভিক্ষেপ'-এর রূপ হল বন্যা, ভূমিকম্প, হারিকেন, সুনামি, অগ্ন্যুৎপাত, মড়ক এবং চেরনোবিল মেল্টডাউনে কিউবার আপৎকালীন পরিষেবা দলের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা বা খেলো করে দেখা। কিউবার অসংখ্য জীবনদায়ী সফল প্রয়াসের পরেও কর্পোরেট মিডিয়ায় এই সত্যি ঘটনাগুলো প্রায়ই চেপে যাওয়া হয়। অনেক আমেরিকানরাই খবরের ফোটোগ্রাফ থেকে প্রথম কিউবার দুর্যোগ মিশন সম্পর্কে জানতে পারেন, যে ছবিতে দেখা যায় ২০০৫ সালে নিউ অরলিয়ান্সে ক্যাটরিনা হারিকেন হওয়ার পরে ১৫৮৬ জন ডাক্তার হাভানা ছাড়ার জন্য অপেক্ষারত। প্রেসিডেন্ট বুশ কিউবার সহযোগিতার হাত বাড়ানোর প্রস্তাব শোনামাত্রই খারিজ করে দেন। শুধু কি তাই? যখন মার্কিন স্টেট দপ্তরের মুখপাত্র সিন ম্যাককর্ম্যাক পঞ্চাশটি সংস্থা এবং দেশকে সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানায়, কিউবা লক্ষণীয়ভাবে সেই সাহায্যকারী দেশের তালিকাতে অনুপস্থিত।

পাঁচ বছর পরে হাইতি, বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পরে, কিউবার সাহায্য গ্রহণে একটুও পিছপা হয়নি। ১৯৯৮ সাল থেকে বহু কিউবান চিকিৎসা-কর্মী হাইতিতে উপস্থিত থাকায় কিউবাই সাহায্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। বহু বছর ধরে ৬০০০ কিউবান চিকিৎসাকর্মীরা তিন লাখ হাইতিবাসীকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছিল। কিউবার হাইতির আপৎকালীন অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছিল, যখন ২০০৪ সালে প্রচণ্ড বন্যায় কিউবা সেখানে চিকিৎসা দল পাঠায়। ২০১০-এর ভূমিকম্পের একমাসের মধ্যে অনেক দেশের আপৎকালীন দলই ময়দান ছেড়ে পালায়। কিন্তু ৬০০ কিউবান এবং ৩৮০ হাইতিয়ান, যাঁরা কিউবান চিকিৎসা-শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষিত, তাঁরা রয়ে যান। ২০১০-এর অক্টোবর মাসে হাইতিতে শতাব্দীতে প্রথম কলেরার মড়ক লাগে। কিউবানদের যদি দুর্যোগ মোকাবিলার ত্রাণ কাজের প্রাথমিক উত্তেজনা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো দেশে থাকার অভ্যেস না থাকত, বা কিউবানরা যদি হাইতিবাসীদের প্রতিরোধকারী ওষুধ সম্বন্ধে প্রশিক্ষিত না করত, কলেরায় মৃতের সংখ্যা আরও বেশি হত।

যদিও কিউবা হাইতিতে ভূমিকম্প হওয়ার অনেক আগে থেকেই উপস্থিত থাকায় দ্রুততম এবং পেশাদারি আপৎকালীন পরিষেবা দিয়েছিল, এবং ভূমিকম্প যখন প্রায় বিস্মৃত অতীত তখনও তারা সে-দেশ ছেড়ে যায়নি, তবুও স্পেন-এর মুখ্য খবরের কাগজ, *এল পাই-তে* সাহায্যকারী

দেশের তালিকায় কিউবার কোনো উল্লেখ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় কিউবার অবদান কোনো স্বীকৃতি পায়নি। ফক্স নিউজ বস্তুতপক্ষে কিউবার এই বলে সমালোচনা করে যে তারা কোনো সহায়তাই করতে পারেনি। এদিকে হাইতিতে ২২০০০ আমেরিকান মিলিটারি জাঁকিয়ে বসেছিল। মার্কিন ডাক্তাররা যে শুধু কিউবানদের থেকে অনেক দেরিতে হাইতিতে হাজির হয় তাই নয়, তারা চলেও যায় অনেক আগে-আগেই। গাদাগাদি করে থাকা হাইতিয়ান দুর্ঘটনাগ্রস্তদের মধ্যে থাকতে তাদের বয়েই গেছে। কাজের ঘণ্টা শেষ হলেই আমেরিকানরা ছুটত বিলাসবহুল হোটেলের দিকে, আর কিউবার ডাক্তাররা হাইতি জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যেই তাদের পরিষেবায় দিন কাটাত।

কার্ক গরিব দেশগুলোর মেডিক্যাল সংকটকালে ধনী দেশের এই ধরনের সাড়া দেওয়াকে 'দুর্যোগ বিহার' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন, অনেকেই দুর্ঘটনাস্থানে যায়, 'দুর্ঘটনা কবলিত মানুষদের উপযুক্ত সেবা করার বদলে ''অভিজ্ঞতা'' সঞ্চয় করতে'। অনেকেই শেষ অবধি দরকারি উদ্ধারকাজে প্রচুর ঝামেলা পাকিয়ে ফেলে। অন্যদিকে কিউবান ডাক্তারদের দৃষ্টিভঙ্গি 'দুর্যোগ বিহারের' সম্পূর্ণ বিপরীত। কিউবানদের আন্তঃসাংস্কৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় গভীর প্রশিক্ষণ আছে। সে প্রশিক্ষণ গড়ে উঠেছে হাজার হাজার চিকিৎসা-কর্মী, যারা ইতিমধ্যেই দরিদ্র দেশগুলোতে কাজ করছিল, তাদের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে। কিউবার রেসপন্স দল বা বদলীকৃত কর্মী আক্রান্ত দেশে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর থেকে জনগোষ্ঠীর জন্য ওষুধ বা প্রতিরোধক স্বাস্থ্যের কর্মসূচি তৈরিতে সাহায্য করে গেছে।

কিউবা যেভাবে তার আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল পলিসি অনুযায়ী অন্য দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সহযোগিতার হাত বাড়ায়, অনেকভাবেই ভেনেজুয়েলা যেন তার এক প্রতিরূপ। এটা শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালে, হুগো শাভেজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরের বছর, বন্যার সময় কিউবার সাহায্য করা থেকে। প্রথম মেডিক্যাল সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০০০ সালে ভেনেজুয়েলান ডানপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও। এই বিরোধিতা অনেকটাই কমে আসে যখন ভেনেজুয়েলান শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। অসংখ্য ভেনেজুয়েলাবাসী কিউবান বা কিউবান দ্বারা প্রশিক্ষিত ডাক্তারদের কাছ থেকে চিকিৎসা পেতে থাকেন। ফিলহাল সবথেকে বড়ো যে পরিবর্তনটা নজরে পড়ছে তা হল এতদিন যে স্বাস্থ্য-পরিষেবা কিউবার ডাক্তাররাই চালাত, কিউবায় নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দিত—সে সব কাজের অনেকটাই এখন ভেনেজুয়েলিয়ানরা নিজেরাই করছে, করতে পারছে। ১৯৯০ সালে যেখানে ১০০০ শিশু পিছু মৃত্যুহার ছিল ২৫, ২০১০ সালে তা ১৩-তে নেমে আসে।

অপারেশন মিলাগ্র (অলৌকিক অপারেশন), যার মধ্যে দিয়ে তিন লাখ মানুষের দৃষ্টি ফেরানো হয়, ঘটনাক্রমে ভেনেজুয়েলাতেই শুরু হয়। ২০০৪-এ ভেনেজুয়েলা ও কিউবা একটা সাক্ষরতা কর্মসূচিতে একসঙ্গে কাজ করছিল, যেখানে আট লাখ মানুষকে সাক্ষর করতে গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন যে বেশিরভাগ মানুষের নিরক্ষরতার কারণ ক্ষীণ দৃষ্টি। ভেনেজুয়েলা এবং গোটা লাতিন আমেরিকা থেকে অসংখ্য রোগী হাভানায় চোখের অস্ত্রোপচারের জন্য জড়ো হন। কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্বে কিউবা, ভেনেজুয়েলা ও বলিভিয়ার ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দেয় যাতে তাঁরা নিজের এবং পড়শি দেশের মানুষের চোখের অস্ত্রোপচার নিজেরাই করতে পারেন। অল্প খরচে এত মানুষের জীবন আলোকিত করে অপারেশন মিলাগ্র বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছে। লাতিন আমেরিকায় বেশিরভাগ অন্ধত্বের কারণ দূষিত জল, অপুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সীমিত সুযোগ, তাই এটি নিরাময়যোগ্য। একটা ধনী দেশের থেকে গরিব দেশে অন্ধত্ব বেশি যন্ত্রণাদায়ক: পরিবারের কাছে অন্ধ আত্মীয়দের দেখাশোনার সংস্থান সীমিত থাকায় তারা পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে পড়ে আর সাধারণ মানুষের গড় আয়ুর তুলনায় তারা অর্ধেক কাল বাঁচে।

'Health Care Without Borders' (সীমান্তহীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা) যখন অক্ষমতা প্রসঙ্গে অনুসন্ধানমূলক কাজে রত হয় তখনই দৃষ্টিহীনতার সমস্যা এর সঙ্গে জোড় বাঁধে। এদের মনে করা হত পরিবারের বোঝা। প্রতিবন্ধী বা discapacitados ('দিসকাপাসিতাদোস')-দের মনে করা হয় minusvalidos ('মিনুসভালিদোস'), অর্থাৎ যাদের কোনো মূল্য নেই, বেঁচে থাকাটাই নিরর্থক। মার্কিন রাষ্ট্রে অক্ষম মানুষের চাহিদা মেটানো নিয়মমাফিক একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু হতদরিদ্র দেশগুলোতে এটা যেমন অস্বাভাবিক তেমন বিরল ঘটনা। লাখ লাখ লাতিন আমেরিকার মানুষ অবাক চোখে দেখে কিউবানরা সরকারকে সঙ্গে নিয়ে তাদেরই সমস্যার মোকাবিলা করছে, যতটা সম্ভব সমস্যার নিরসন করছে। তাদের কারও কারও কাছে পৌঁছে যাচ্ছে হেলিকপ্টারে, গাধার পিঠে চেপে, কখনো-বা ডিঙি নৌকা করে। বলিভিয়া-তে যে ১০১টি জনগোষ্ঠীর উপর সমীক্ষা করা হয়েছিল, তাদের বসবাস এতটাই দুর্গম এলাকায় যে কোনো মানচিত্রেই সেসব এলাকাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৩ সালের মধ্যে কিউবা একটা কাজের কাজ করতে পেরেছিল। ভেনেজুয়েলা, ইক্যুয়েডর, নিকারাগুয়া, বলিভিয়া, ও সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডায় লাখ লাখ মানুষকে হুইলচেয়ার, ওয়াকার, কানে শোনার যন্ত্র (হিয়ারিং এইড), এবং কৃত্রিম অঙ্গ বিতরণ করে কেজো-মদত দিতে পেরেছিল।

যদিও কার্ক-এর আলোচনার বেশিটাই পরিচিত বিষয়, যেমন কিউবার মেডিক্যাল আন্তর্জাতিকতার প্রসঙ্গকে ঘিরে, তেমনি আবার চেরনোবিল বা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মতো পাঠকের কাছে কম পরিচিত বিষয়কেও তুলে ধরে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কয়েক বছর আগে ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ সালে চেরনোবিল মেল্টডাউনে কিউবাকে তার মানবতাবাদের বড়ো মূল্য চোকাতে হয়েছিল। কিউবা তার আগল উন্মুক্ত করে হাসপাতালের শয্যা, এবং ২৫০০০ ইউক্রেনবাসী যাদের বেশিরভাগ শিশু, তাদের জন্য গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প খুলে দেয়। অনেকেরই গভীর ক্ষত বা দীর্ঘস্থায়ী রোগবিকার ছিল। কিছু মানুষকে কিউবার হাসপাতালে মাসের পর মাস বা একাধিক বছর ধরে থাকতে হয়। ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকভিচ তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিকিৎসার সব খরচা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ইউক্রেন কোনোদিনই কিউবার ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। যেখানে শুধুমাত্র ওষুধের দামই আনুমানিক ৩৫ কোটি ডলার।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপদেশগুলোও কিউবাকে কোনো

অর্থনৈতিক পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয়নি, কার্যত কোনো বাণিজ্য, কোনো বিনিয়োগ করার সুযোগ তারা পায়নি। তাও কিউবা শ-য়ে শ-য়ে মেডিক্যাল কর্মী ওই অঞ্চলে পাঠায়, যারা আবার পালা করে শ-য়ে শ-য়ে ছাত্রকে হাভানায় পাঠায় চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ নিতে। কিউবা টিমর-লেস-এ একটা ছোটো মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করতে সাহায্য করে যেটা এখন অন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপদেশগুলোর জন্য চিকিৎসক তৈরি করছে। ঘটনাক্রমে অর্ধেক কিউবান ডাক্তার মহিলা হওয়ায় জাভায় খুব কাজে লেগে গিয়েছিল কারণ সেখানে মুসলিম নারীরা পুরুষের কাছে পরীক্ষা করাতে চাইত না।

কার্ক-এর কিউবার মেডিক্যাল বায়োটেকনোলজি গবেষণার পরিচ্ছেদটি আমাকে সবথেকে বেশি আন্দোলিত করেছে (যদিও অনেকের কাছে এটা মর্মান্তিক)। আমি সেন্ট লুই-এর বাসিন্দা। যেখানে মনসান্টোর পণ্য-শস্যের বিশাল খামার। আমি কোম্পানির সদর দপ্তরের সামনে বহু বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিয়েছি, যোগ দিয়েছি অনেক আলোচনা-মঞ্চে, সম্মেলনে। মনে হয়, বিশ্ব কর্পোরেশনগুলো যেভাবে বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে এবং কিউবা যেভাবে করে তার একটা তুলনা করে দেখা দরকার—এ-দুটোর উদ্দেশ্য মূলত এক নাকি দুয়ে মৌলিক পার্থক্য আছে?

প্রযুক্তি চালু হলে তার নানারকম প্রভাব দেখা যায়। যেমন অ্যান্টিবায়োটিক। সমাজে এর প্রভাব ভালো, যদিও এটার নিশানা আসলে কর্পোরেট-মুনাফা। আবার অন্য কোনো প্রযুক্তি সংগঠিত শ্রমশক্তিকে ভিতর থেকে ক্ষয় করে দেয়, বিনষ্ট করে। ১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি শিকাগোর ম্যাক্‌কর্মিক ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট নতুন ঢালাই শ্রমিকদের জাতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দক্ষ শ্রমিকদের জায়গাটা নিয়ে ফেলল। এছাড়া আরও প্রযুক্তি আছে যেগুলো ছোটোখাটো শিল্প-প্রতিযোগীদের বাজারে টিকতে দেয় না যাতে বড়ো কোম্পানিগুলো বাজারকে তাদের তাঁবে রাখতে পারে। তবে এ-বিষয়ে কৃষিতে জিন-বদলানো জীব [Genetically Modified Organisim (GMO)] প্রযুক্তির প্রয়োগের মতো দুষ্ট উদাহরণ আর দু-টি নেই। জিএমও-দৈত্য (কর্পোরেট) মনসান্টো খাদ্যপণ্যের দাম চড়চড় করে বাড়িয়ে যেতে পারে—প্রথমত বাজারটাকে সে পুরোপুরি কবজা করে নেয়; কড়া নজর রাখে যাতে যেগুলো জিএমও-বীজ নয় সেসব বীজ বাজারে না-মেলে। দ্বিতীয়ত, প্রতিবাদী-প্রতিরোধী কৃষকদের বিরুদ্ধে হাজারো-এক মামলা ঠুকে দিয়ে মানুষের মনে ভয় ছড়িয়ে দেয়। তৃতীয়ত, চাষের কীটনাশকের ব্যবহারকে তারা চাষিদের মনে নেশার মতো ধরিয়ে দেয়। এর নিশ্চিত পরিণাম—তামাম দুনিয়ায় ছোটো চাষিরা এইসব বীজ ও কীটনাশক উৎপাদক বহুজাতিক-প্রভুদের প্রায় কেনা-গোলামে পরিণত হয়।

নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে শ্রমশক্তিকে বিনষ্ট করতে বা বাজার নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে পুঁজি সর্বদাই নিরেস মাল উৎপাদনে আগ্রহী। ম্যাক্‌কর্মিক যে ঢালাই মেশিনের ব্যবহার করত তা খুব খারাপ মানের লোহা—নিম্নমানের ঢালাই উৎপাদন করত, অথচ ক্রেতাকে তা কিনতে হত চড়া দামে। কারণ একটাই—ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এটা একটা অমোঘ অস্ত্র। একইভাবে, কৃষিতে জিএমও-রা খারাপ মানের খাদ্য উৎপাদন করে। যেহেতু দুই-তৃতীয়াংশ জিএমও সৃষ্টি হয়েছিল এমন ফসল উৎপাদন করতে যারা বিষাক্ত কীটনাশক যেমন, রাউন্ডআপ, সহ্য করতে পারে, তাই জিএমও-র ব্যবহারের পাশাপাশি কীটনাশকেরও বাড়তি ব্যবহার হতে থাকে। ভুট্টার রস তৈরিতেও জিএমও ব্যবহার করা হয়। প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, যার ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, তাকে মিষ্টত্ব দিতে ওই মিষ্টি ভুট্টারসের দরকার পড়ে—ফলে বাড়ে মানুষের স্থূলতার সংকট। একইসঙ্গে পরিবহণকালে ও অনেকদিন তাকে থাকলেও খাদ্যদ্রব্য যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য জিন-প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে সমধর্মী খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়—এতে মার খায় খাদ্যের পুষ্টিগুণ। কর্পোরেট-কৃষিতে জিএমও-র যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে মানুষ একইসঙ্গে সব থেকে বড়ো যে দু-টি রোগে ভুগছে তা হল স্থূলতা আর অপুষ্টি।

কর্পোরেট কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির এইসব সর্বনাশা প্রভাবের সঙ্গে কীভাবেই-বা কিউবার ওষুধে বায়োটেকনোলজির ব্যবহারের তুলনা করা যায়? কার্ক সংশয়াতীতভাবে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, কিউবা যেসব নতুন ওষুধ তৈরি করেছে তা মানুষের জীবনকে আরও উন্নত করে তুলেছে, সঙ্গে সঙ্গে এর বায়োটেকনোলজির জ্ঞান অন্য দেশের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে তাদের মুষড়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে, করে তুলেছে স্বনির্ভর ক্ষমতাসম্পন্ন। এমনকী কিউবার ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুত ওষুধের একটি আংশিক তালিকাও মনে গভীর দাগ কাটে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় হেবেরপ্রট বি-র ব্যবহারে অঙ্গচ্ছেদ ৮০ শতাংশ কমে গেছে। কিউবাই একমাত্র দেশ যারা টাইপ বি ব্যাকটিরিয়াল মেনিনজাইটিসের প্রতিরোধে প্রভাবশালী ভ্যাক্সিন তৈরি করে ও প্রথম হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি (Hib), যা প্রায় অর্ধেক ফ্লু সংক্রমণের কারণ, তার সিন্থেটিক ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করে। এছাড়াও কিউবা অতিরিক্ত মাত্রায় অগ্রসর ফুসফুস ক্যান্সারের ভ্যাক্সিন র‍্যাকোটামোম্যাব তৈরি করেছে এবং মারাত্মক সোরিয়াসিস রোগের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় আইটোলিজুমাব-এর জন্য ডাক্তারি পরীক্ষাও শুরু করে দিয়েছে।

এইসব এবং আরও অন্য অসংখ্য মেডিক্যাল আবিষ্কারের পেটেন্ট কিউবা সরকারের আছে। এইসব নতুন ড্রাগের দাম নির্লজ্জের মতো চড়চড় করে বাড়িয়ে বাড়তি মুনাফা তোলার কোনো তাড়না তাদের নেই, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজারভিত্তিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিকাঠামোয় এইসব ওষুধের যা দাম হতে পারে, তার থেকে অনেক কম দামেই কিউবাবাসীরা তা কিনতে পারে। এ জন্যই কিউবার মেডিক্যাল আন্তর্জাতিকতা গোটা বিশ্বে এক গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। এই দেশ ভ্যাক্সিনসহ ড্রাগ সরবরাহ করে, তাও এমন কম দামে যা বিদেশে মানবতাবাদী অভিযান আরও জোরালোভাবে কাজ করতে পারে। মেনিনজাইটিস ও নিউমোনিয়ায় সিন্থেটিক ভ্যাক্সিনের ব্যবহার লাতিন আমেরিকায় লক্ষাধিক শিশুকে রোগবীজমুক্ত করতে পেরেছে।

কিউবার মেডিক্যাল বায়োটেকনোলজির দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে কর্পোরেট বিশ্ব এখনও কিছুই জানে না। এটা গরিব দেশে নতুন প্রযুক্তি চালান করা, যাতে তারা নিজেরাই ওষুধ প্রস্তুত করে নিতে পারে। ব্রাজিলের সঙ্গে এই সহযোগী উদ্যোগের ফল—মেনিনজাইটিস ভ্যাক্সিনের দাম ১৫ থেকে ২০ ডলারের বদলে এক লাফে ৯৫ সেন্ট প্রতি ডোজে নেমে আসে। কিউবা এবং ব্রাজিল একযোগে অন্য অনেক বায়োটেকনোলজি প্রকল্পে কাজ

করছে, তার মধ্যে আছে হেপাটাইটিস সি-এর জন্য ইন্টারফেরন আলফা ২বি, ও দুরারোগ্য কিডনির সমস্যায় তৈরি হওয়া রক্তাল্পতার জন্য রিকমবিন্যান্ট হিউম্যান এরিথ্রোপোয়েটিন (rHuEPO)।

কার্ক-এর কৃষি বায়োটেকনোলজির আলোচনা অ্যান্টি-পেস্ট বিষের মধ্যেই সীমিত, যেমন বায়োর‍্যাট—যা পেরুতে ছড়িয়ে পড়া বিউবোনিক প্লেগ রুখতে ইঁদুর মারতে কিউবা পাঠিয়েছিল। মনে করা হয় বায়োর‍্যাট থেকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই কারণ এটা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য, মনসান্টো-ও দাবি করে যে রাউন্ডআপ থেকে ভয়ের কোনো কারণ নেই কেননা এটাও 'ধ্বংস' হয়, কিন্তু এর ফলে প্রাপ্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলো ভীষণভাবে বিষাক্ত। পেস্টিসাইড বা সাইকোট্রপিক ড্রাগের ইতিহাস, যেগুলোকে নিরাপদ বা খুবই সামান্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে বলে দাবি করা হয়, এবং পরে যাদের মারাত্মক সব পরিণাম দেখতে পাওয়া যায়, তাদের তালিকা যেমন দীর্ঘ তেমনি যন্ত্রদায়কও বটে। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি, মহামারি নিয়ন্ত্রণে কিউবার টক্সিনের (যেগুলো বায়োটেকনোলজি দ্বারা তৈরি সেগুলোও) ব্যবহার এখনও বিচারাধীন।

কোনো দেশের মেডিক্যাল নীতি যদি নেতিবাচক অনুশীলন মদত দিতে থাকে তাহলে তারা লাখ লাখ জীবন রক্ষা করেছে বলে তাদের কোনো ছাড় দেওয়া যায় না। প্রতিটি নতুন সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন বিবেচনা এবং সাথিসুলভ সমালোচনার জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। বলার অপেক্ষা রাখে না কিউবা এমন ভুল করেছে যা সাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারত। অন্য সব ক-টা ভুলকে একত্র করলেও তার থেকেও বড়ো এবং মারাত্মক ভুল যা কিউবা করেছে তা হল ১৯৮০-র দশকে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত। ওই প্রকল্পটি ১৯৮৯-৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং তার ফলে পুঁজির ঘাটতির দরুন ভেঙে যায়, কিন্তু যদি প্রকল্পটি চলত, তা মোটেই স্বাস্থ্যকর হত না; অন্তত বলা যায় ওই দ্বীপে বসবাসকারী শিশু এবং অন্য জীবদের জন্য আরেকটি চেরনোবিল বা ফুকুশিমার সংকট ডেকে আনত। আরেকটা খুবই অনুশোচনা করার মতো পরিকল্পনা হল মারিজুয়ানার প্রতি কিউবার প্রায় ১৯৫০-এর দশকের দৃষ্টিকোণ। যেহেতু এটা বেড়ে ওঠা আগাছাদের মধ্যে সবথেকে সস্তা এবং এর সুদূরপ্রসারী ভিন্ন ভিন্ন মেডিক্যাল প্রয়োগও আছে; তাই ওই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কিউবা অল্প খরচে নানা ধরনের চিকিৎসায় অবদানের সুযোগ হারায়।

এখানে কিউবার এইসব জটিল সমস্যামূলক সিদ্ধান্তগুলোকে আমরা মোটেই উপেক্ষা করব না ঠিকই, কিন্তু এগুলো কিউবার বিশ্ব স্বাস্থ্যে অবদানের কাছে নস্যিমাত্র। *Health Care Without Bordrs* (সীমান্তহীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা) অনুপুঙ্খভাবে নথিবদ্ধ করে রেখেছে কীভাবে তারা একটা বিশেষ জায়গায় স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ করতে গিয়ে সে সব জায়গায় তাদের প্রযুক্তির চালান করেছে; সঙ্গে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার পরিকাঠামোর এক নতুন নকশাও তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। কর্পোরেট-বিশ্বে ওষুধের যে চড়া দাম তার সঙ্গে এই ব্যবস্থাটার যে আকাশপাতাল ফারাক তাও কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়? একটা উদাহরণ দিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হবে। রোডেলিজ কর্পোরেশন সাইক্লোসেরিন উৎপাদনের স্বত্ব এবং বরাত পায়। ড্রাগ-প্রতিরোধী যক্ষ্মার চিকিৎসায় হাতেগোনা যে ক-টি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়, সাইক্লোসেরিন তার একটি। বরাত পেয়েই রোডেলিজ-এর দাম ২০০০ শতাংশ বৃদ্ধি করে, যার ফলে এই ওষুধ দিয়ে পুরো চিকিৎসা করতে খরচ ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার।

অক্টোবর ২০১৫-য় জানা যায় যে ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) ফার্মাসিউটিক্যালদের পেটেন্ট সুরক্ষার সময়কাল বাড়িয়ে বারো বছর করবে। সেই সময়ের মধ্যে, সস্তার জেনেরিক বিকল্প ওষুধগুলোকে নামিদামি ব্র্যান্ড ওষুধের বদলে বিক্রি করা যাবে না, এর ফলে হাজারে হাজারে, হয়তো লাখে লাখে, বারোটি টিপিপি আওতাভুক্ত দেশের মানুষ টাকাপয়সার অভাবে সংকটকালের ওষুধ কিনতে পারবে না। এই ধরনের বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো দেখে মনে হয়, ওষুধ কোম্পানিগুলো যেন এক ঝাঁক হাঙরের মতো পরম সন্তোষে লেজ নাড়াচ্ছে; চোরা চাউনিতে ঝরে পড়ছে লালসা: আর একটু পরেই তো তারা মেতে উঠবে উন্মত্ত ভোজে—ঝাঁপিয়ে পড়ারই যা অপেক্ষা। উৎপাদন হোক, চাই আরও বেশি বেশি মুনাফা। বিশ্ব জুড়ে পুঁজির চাহিদা—মুনাফার জন্যই উৎপাদন। কিউবা পথ গড়ে নিচ্ছে পুরোপুরি এর বিপরীতে। সেই উলটো পথে হাঁটতে হাঁটতে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে কর্পোরেটগুলোর দিকে।

মূল রচনা: Cuba's Medical Mission by Don Fitz, *Monthly Review,* February 2016 স্বাস্থ্যের বৃত্তে

অনুবাদ: তনুশ্রী দাস বিশ্বাস, প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়।

Advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিরোধ

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বা প্রতিরোধ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব থেকে বড়ো জয়ধ্বজা—সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে অবধারিত সাফল্যের আশ্বাস—তার ওপরে বড়োসড়ো এক প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থটি যেমন জীবনের ধর্ম মেনেই প্রকৃতিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সও প্রকৃতির নিয়ম, মানুষই এতদিন তাকে বুঝতে চায়নি—**লিখেছেন ডা. অপূর্ব।**

ছয় বছরের সম্পদ বিশ্বাস মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে এসেছিল নিউমোনিয়া নিয়ে। মারাত্মক শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসা প্রায় জ্ঞানশূন্য সম্পদকে সঙ্গে সঙ্গে পিকু-তে ভেন্টিলেটরে তোলা হয়। পিকু বা PICU হল Paediatric Intensive Care Unit, যেখানে গুরুতর অসুস্থ বাচ্চাদের চিকিৎসা করা হয়। সম্পদের জ্ঞান আর কোনোদিনই ফিরে আসেনি। সপ্তাহখানেক পর সম্পদের রক্তের কালচারের রিপোর্টে ক্লেবসিয়েলা নিউমোনি (Klebsiella pneumoniae) পাওয়া যায়। এবং জানা যায় ব্যাকটিরিয়াটি সমস্ত রকম জীবাণু মারার ওষুধ-প্রতিরোধী, অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট। ১১ দিন পর সম্পদ মারা যায়।

অন্য আরেকটা ঘটনা। জেলার এক হাসপাতালে 'সিজার' করে বাচ্চা জন্ম দেন প্রতিমা। কয়েকদিন পর থেকে সেলাই-এর জায়গা থেকে রস বেরোতে শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যেই সেলাই-এর জায়গাটা পুরো খুলে গিয়ে সেখান দিয়ে মল বেরোতে শুরু করে। মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসার পর ডাক্তার বলেন প্রতিমার অপারেশনের জায়গায় জীবাণু সংক্রমণ (surgical site infection) হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের সঙ্গে অপারেশনের কাটা জায়গাটার একটা সংযোগকারী নালী তৈরি হয়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলে এনটেরোকিউটেনিয়াস ফিস্চুলা (enterocutaneous fistula)। প্রতিমার শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পরেও দ্রুত অপারেশন করা যায়নি। কাটা জায়গার রস নিয়ে কালচার করে পাওয়া যায় স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস (Staphylococcus aureus) যা বেশিরভাগ অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি রেজিস্ট্যান্ট। প্রতিমা দিন কুড়ি পরে সেপসিস (সারা শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া) হয়ে মারা যান।

উপরের দুটো ঘটনাই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ে। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কথাটা আমরা আজকাল প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি। খবরের কাগজেও বেরোচ্ছে। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ যাদের নিকেশ করতে ব্যবহার করা হয় সেই অণুজীবেরা বা জীবাণুরা নাকি আজকাল বিশেষ পাত্তাটাত্তা দিচ্ছে না অ্যান্টিবায়োটিকদের। নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক বের করেও নাকি কাজ হচ্ছে না। বছর না ঘুরতেই অণুজীবেরা অ্যান্টিবায়োটিককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর নতুন ফিকির খুঁজে ফেলছে, মানে হয়ে যাচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট। আমরা দেখব, কী এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। তার আগে অ্যান্টিবায়োটিকের ইতিহাস ভূগোল নিয়ে একটু হোমওয়ার্ক করে নিলে বুঝতে সুবিধা হবে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের পানি কতটা গভীর।

অ্যান্টিবায়োটিক এক ধরনের ওষুধ যা ব্যবহৃত হয় অণুজীব সংক্রমণ বা ইনফেকশন রোধ করতে। বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্নভাবে কাজ করে। কিছু অ্যান্টিবায়োটিক বিশেষ কিছু অণুজীবকে পুরোপুরি মেরে ফেলে, আবার কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অণুজীবদের বৃদ্ধি ও বিভাজন থামিয়ে দেয়। ১৯২৮ সালে হাওয়ার্ড ফ্লোরি, আর্নস্ট চেন ও আলেকজান্ডার ফ্লেমিং প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। তারও আগে থেকে বিভিন্ন ছত্রাকের মোল্ড ও প্রক্রিয়াজাত পদার্থ জীবাণু মারার কাজে ব্যবহারের হদিশ পাওয়া গেলেও আজ আমরা অ্যান্টিবায়োটিক বলতে যা বুঝি তার যাত্রা শুরু পেনিসিলিন থেকেই। ১৯৩২ সালে আবিষ্কার হয় সালফোনামাইড গ্রুপের জীবাণুনাশক, তাদের অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয়নি নানা কারণে। ১৯৪০-৫০-এর দশকে বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের সংক্রমণের চিকিৎসার জন্যে নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করার তাগিদে একে একে স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরামফেনিকল, টেট্রাসাইক্লিন আবিষ্কার হয়। এই সময় থেকেই এই নতুন পদার্থগুলো যেগুলো জীবাণু সংক্রমণের মোকাবিলা করতে পারে তাদের অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে চিহ্নিত করা শুরু হয়। এরপর একে একে ফ্লুওরোকুইনোলোন ও আরও অন্যান্য গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়। একই সঙ্গে চলতে থাকে একই গ্রুপের আরও বেশি কর্মক্ষম ও শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক এবং সিন্থেটিক অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি। অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষমতা অনেকটা বাড়িয়ে দেয়। জীবাণু সংক্রমণ বা ইনফেকশন, যা ছিল এক সময়ের ভয়ংকরতম সমস্যা, অ্যান্টিবায়োটিকের কল্যাণে সেই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা নেহাতই সহজ হয়ে আসে।

বেশ ভালোই চলছিল পুরো ব্যাপারটা, অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই পটাপট পটল তুলছিল জীবাণুর দল। কিন্তু বেশিদিন এমনি চলল। না ক্রিটিকাল কেয়ারের ডাক্তারবাবু থেকে ওষুধ দোকানের কম্পাউন্ডার মায় পাড়ার কাকা জ্যাঠা দাদারা পর্যন্ত যখন মুড়িমুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে যাচ্ছেন তখনই একসময় দেখা গেলে যে অ্যান্টিবায়োটিকে যে অণুজীবের মারা যাওয়ার কথা ছিল সে আর তত সহজে কাবু হচ্ছে না। বরং নিজের চরিত্র বদলে ফেলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট বা প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে। সেই অ্যান্টিবায়োটিকে আর কাজ হচ্ছে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অণুজীবদের এই চরিত্র বদলে ফেলে অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণ রোধ করে ফেলার যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করছে তাকেই ডাক্তারি পরিভাষায় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলে। শেষে দেখা গেল 'চরিত্রহীন' অণুজীবেরা নিজেদের বদলাতে বদলাতে এমন রূপ নিচ্ছে যে, একসময় যেসব অ্যান্টিবায়োটিক খুবই শক্তিশালী হিসাবে গণ্য হত এরা তাদের প্রতিও রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে। যেসব সংক্রমণ এতদিন সাধারণ সংক্রমণ বলেই ভাবা হত, যেমন মূত্রনালীর সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, সেসব রোধ করাও শেষে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সোজা বাংলায় বলতে গেলে আধুনিক চিকিৎসার

যে অন্যতম সাফল্য সংক্রমণঘটিত রোগ নিরাময়, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স আজ সেই সাফল্যের সামনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। *আনন্দবাজার* থেকে হোয়াইট হাউস সক্কলের মাথা ঘেমে উঠছে এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের চক্করে। কেননা এমন একটা সময় আসতে চলেছে যখন খুব সাধারণ সংক্রমণও প্রতিরোধ করার মতো কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই আর থাকবে না। নিউমোনিয়া থেকে টিবির কোনো ওষুধ না থাকার অর্থ বুঝি আমরা? আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশে?

অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কেন হয়? একে কি আটকানো সম্ভব?

এই জীবাণুদের মধ্যে কী এমন থাকে, কোথায় এমন শয়তানি বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে যার জন্যে এরা মানুষের এত পরিশ্রমের ফসল এই অ্যান্টিবায়োটিকের কেরদানি ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে? জীবাণুরা কি জন্মগতভাবে এতটাই অ-মানুষ? (যদিও জীবাণু শব্দটাই কেমন খারাপ খারাপ, বিজাতীয় শোনায় আমাদের কানে, তবু আক্ষরিক অর্থে জীবাণু মানে অণু-জীব বা ছোটো জীব)। না, জীবাণুরা জন্মগতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয়ে মানুষের সুখনিদ্রা কেড়ে নেওয়ার জন্যে এত কিছু করে না। আর পাঁচটা জীবের মতোই বিবর্তনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে জীবাণুরা পরিবেশের প্রতিকূলতাগুলোকে কাটিয়ে উঠতে চায়। জীবের ধর্মই এই, এই ধর্ম থাকার জন্যই বিবর্তনের পথ বেয়ে একদা মানুষ নামক জীবটি সৃষ্টি হয়েছিল। জীবের সঙ্গে প্রকৃতির আন্তঃসম্পর্কেরই অংশ হল বিবর্তন। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সও সেই বিবর্তনেরই একটি অংশ। মানুষের অনেক অনেক আগে থেকেই ব্যাকটিরিয়া ও আরও অন্যান্য সব অণুজীবেরা পৃথিবীতে এসেছে। সেই সময় থেকেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক, আন্তঃপ্রজাতি, অন্তপ্রজাতি সম্পর্কের পরিবর্তনের মাধ্যমে অণুজীবদের গঠন, ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন এসেছে। আসছে। আসবে। অর্থাৎ বিবর্তনের মতো অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সও অমোঘ। আমরা মানুষেরা চাই বা না চাই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবেই।

অণুজীবেরা প্রধানত তিনভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি রেজিস্ট্যান্ট হয়।

১. কিছু কিছু অণুজীব জিনগত, গঠনগতভাবেই কিছু অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি রেজিস্ট্যান্ট। অর্থাৎ এই সব অণুজীবের দেহে যে সমস্ত জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে, এই সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক সেইসব প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে না।

২. যেসব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক জীবাণুর দেহের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে সেইসব অণুজীবের জেনেটিক গঠনে পরিবর্তন আসে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বা আকস্মিকভাবে, যাকে আমরা বলি মিউটেশন। অনেক সময় ছোটো ছোটো পরিবর্তন জমা হতে হতে বড়ো ধরনের পরিবর্তন ঘটায়।

৩. অণুজীবেরা নিজেদের এই পরিবর্তনগুলো জেনেটিক বস্তু আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজের প্রজন্মের অন্য অণুজীবকে বা পরের প্রজন্মের অণুজীবকে দিয়ে যায়। যার মাধ্যমে এই পরিবর্তন বা রেজিস্ট্যান্স অণুজীব থেকে অণুজীবে ছড়িয়ে পড়ে।

তাহলে কি আমাদের (মানে মানুষদের) কিছু করার নেই? আমাদের কী করার আছে সেটা না হয় পরে দেখব। আপাতত দেখব অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আমাদের বেশ কিছু সাধারণ ধারণা কতটা যুক্তিযুক্ত।

ধারণা ১. অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসাবিদ্যার কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কার —চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাই অ্যান্টিবায়োটিকের জনক। ঘটনা: অ্যান্টিবায়োটিক চিকিসাবিদ্যার কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কার নয়। অ্যান্টিবায়োটিকের উদ্ভব (এবং একইসঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স) বিবর্তনের একটা ধারা। মানুষ পৃথিবীতে আসার অনেক অনেক কোটি বছর আগে থেকেই অণুজীবেরা বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন মিউটেশন বা পরিবর্তন ঘটাতে থাকে নিজেদের শরীরে। অন্য অণুজীবের আক্রমণ, পরিবেশের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে নতুন নতুন জৈবরাসায়নিক পদার্থ বা বিক্রিয়ার সূচনা হয় অণুজীবদের দেহে। এরই ফলশ্রুতি আমাদের তথাকথিত অ্যান্টিবায়োটিক (এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স)। সেই লম্বা বিবর্তন পথের একটা অংশ আধুনিক বিজ্ঞানের আতস কাচে ধরা পড়েছে মাত্র।

ধারণা ২. অ্যান্টিবায়োটিকের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স রোখা যাবে।

যৌক্তিকতা: এই ধারণাটা আমাদের অনেকেরই আছে (এমনকী অনেক ডাক্তারেরও)। কিন্তু ধারণাটি ভুল। অ্যান্টিবায়োটিক যেটা করে সেটা হচ্ছে যে, অণুজীবদের জীবনে চাপ সৃষ্টি করে। জীবনবিজ্ঞানের ভাষায় নির্বাচন চাপ (selection pressure)। সেই চাপ সামলে উঠতে না পারলে অণুজীবটি মরে যায় বা আর বংশবিস্তার করতে পারে না। এই selection pressure যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক দু-রকম অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলেই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ নির্বাচন চাপ বা selection pressure এবং সেই চাপের প্রতিরোধ বা resistance, উভয়েই চলতে থাকবে—সে অ্যান্টিবায়োটিক আমরা যেভাবেই ব্যবহার করি না কেন। তার মানে কি আমরা অযৌক্তিক ব্যবহারের পক্ষে? একদমই না। কারণ অযৌক্তিক ব্যবহারে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সুফল পাব না। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা যাবে না। অযথা পয়সা খরচ হবে রোগীর। এবং তার সঙ্গে রোগীর দেহে থাকা বহু জীবাণু যারা ওই রোগের জন্য দায়ী নয়, তারা অ্যান্টিবায়োটিকটির সংস্পর্শে আসবে, ফলে তাদের দেহে ওই অ্যান্টিবায়োটিকে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবার সম্ভাবনা বাড়বে। রোগীর আশেপাশে থাকা জীবাণুদের মধ্যেও একইভাবে ওই অ্যান্টিবায়োটিকে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হবার সম্ভাবনা বাড়বে। সুতরাং অযৌক্তিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বাড়ায়। কিন্তু সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স পুরো আটকানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

ধারণা ৩. অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কমাতে গেলে অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স খেতে হবে রোগ বা সংক্রমণ সেরে যাওয়ার পরেও।

যৌক্তিকতা: এই ধারণাটি বিতর্কিত। স্বয়ং WHO-র মতে অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স খাওয়া উচিত, সংক্রমণ সেরে যাওয়ার পরেও। কিন্তু এই ধারণার পেছনে যথেষ্ট প্রমাণের অভাব রয়েছে। বরং বেশ কিছু সমীক্ষায় দেখা গেছে সাধারণ সংক্রমণের (যেমন সাধারণ

শ্বাসনালী বা খাদ্যনালী সংক্রমণ) ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স খাওয়া, আর রোগলক্ষণ নির্মূল হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, এই দুই-এর মধ্যে পরেরটিই কম রেজিস্ট্যান্স তৈরি করে। কারণ যত বেশিদিন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হবে, ওই অ্যান্টিবায়োটিকের এনভায়রনমেন্টাল এক্সপোজার হবে তত বেশি। অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিকটি দেহে ও দেহের বাইরে নানা জীবাণুর সম্মুখীন হবে, যেসব জীবাণু হয়তো রোগটির কারণ নয়, কিন্তু পরিবেশে রয়েছে; সে সব জীবাণুর মধ্যেও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। ফলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হওয়ারই সুবিধা হবে। তবে টিবি, লেপ্রসি জাতীয় সংক্রমণের ক্ষেত্রে রোগ সারানোর জন্যই দীর্ঘদিন অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। একটা জিনিস যেটা বুঝে নেওয়ার রয়েছে সেটা হচ্ছে, অণুজীবদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়ী হওয়ার কোনো উপায় নেই। অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়েছে, হচ্ছে, হবে, হবেই। তবে আমরা এর গতিটাকে কিছুটা কমাতে পারি বেশ কিছু উপায়ে। সমস্ত দিকগুলোকে ধরা এই লেখার পরিসরের বাইরে। তবে কিছু কিছু দিক উল্লেখ করা যেতে পারে।

১. ডাক্তাররা যা করতে পারেন: অ্যান্টিবায়োটিক যথাযথ ব্যবহার করা। অপ্রয়োজনে ব্যবহার না করা (যেমন ভাইরাল সংক্রমণে)। যতদূর সম্ভব জীবাণু কালচার পরীক্ষা করে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যাতে সহজে সংক্রমণ নির্মূল করা যায়।

ডাক্তাররা কেন অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ অপব্যবহার করেন? তিনটি মূল কারণ আছে—অজ্ঞানতাবশত, রোগীর মন রাখার জন্যে, বা ওষুধ কোম্পানি বা দোকানের থেকে নানারকম সুবিধা (কমিশন ও অন্যান্য) আদায়ের জন্য। শেষেরটি অত্যন্ত অনৈতিক, কিন্তু এদেশে ঘটেই না—এমন বললে মিথ্যে বলা হবে।

২. রোগীরা যা করতে পারেন: অকারণে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়া। ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক খেতে বললে কারণ জানতে চাওয়া। এবং পুরো কোর্স খাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা ভালো করে জেনে নেওয়া।

৩. অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আরেকটি কারণ হল গবাদি পশুদের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ অনিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক পরিবেশে, নদী-নালায়-মাটিতে মেশে, সেখানে অণুজীবেরা এই অ্যান্টিবায়োটিকের সংস্পর্শে এসে সিলেকশন প্রেশারে মিউটেটেড বা পরিবর্তিত হয়, যার মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি ত্বরান্বিত হয়। এই দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। সরকার এতাবৎ এব্যাপারে একেবারেই উদাসীন।

তথ্যসূত্র:

১. American Society for Microbiology. ''Antibiotic reduction campaigns do not necessarily reduce resistance.''*Science Daily,* 29 July 2013.(www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130729133434.htm.)

২. American Society of Agronomy. ''challenges, opportunities for reducing antibiotic resistance in agricultural settings.'' *Science Daily,* 18 October 2013. (www.sciencedaily.com/releases/2013/10/131018132308htm.)

৩. University of York. ''Antibiotic resistance: it's a social thing'' *Science Daily,* 15 March 2016. (www.sciencedaily.com/releases 2016/03/160315090336htm.)

৪. Centers for Disease Control and Prevention. Antibiotic/Antimicrobial Resistance https://www.cdc.gov/druresistance/)

৫. World Health Organisation. Antimicrobial resistance. (http://www.who.int/medicentre/factsheets/fs/194/en/)

৬. Duration of antibiotic therapy and resistance.http://(www.nps.org.au/publications/health-professional/health.news-evidence/2013/duration of-antibiotic-therapy).

৭. WHO's first global report on antibiotic resistance reveals serious, worldwide threat to public health. http://(www.who.int/medicentre/news/releases/2014/amr-reprot/en/).

৮. MYTHS SURROUNDING ANTIBIOTICS. http://www.medscape.com/viewarticle/870145?nlid=110242_3561&sre=WNL_mdplsfeat_161025_mscpedit_wirbeac=228080CR&spon=17limpID=1222061& faf=1.

৯. *A Brief History of the Antibiotic Era: Lessons Learned and Challenges for the Future*. Rustam I.Aminov. https://www.ncbi. nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC3109405/।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. অপূর্ব, এমবিবিএস, একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তার।

advt.

'অনীক' পত্রিকা বিগত ৫০ বছরের বেশি ধরে চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন

ডায়াবেটিসে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজ দীর্ঘ সময় ধরে শরীরের বিভিন্ন কলাকোষে উপস্থিত থেকে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। ডায়াবেটিসে পায়ের সমস্যা ও তার থেকে অঙ্গহানি এরই একটি উদাহরণ। এর প্রতিরোধ ও চিকিৎসা নিয়ে লিখেছেন **ডা. নিবেদিতা**।

ডায়াবেটিস থেকে সুগার নামে রোগটি আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। জীবনযাত্রা যতই যন্ত্রনির্ভর হয়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থূল হওয়ার প্রবণতা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন (উচ্চ রক্তচাপ), হার্টের অসুখ ইত্যাদি রোগও বেড়েছে। ২০১০ সালের গণনা অনুযায়ী, ভারতের প্রায় ৫০০ লক্ষ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। যদি যথেষ্ট সচেতন না হওয়া যায় তাহলে প্রতি বছর এই সংখ্যা আরও ১৮ লক্ষ করে বেড়ে চলবে। এভাবে বেড়ে চলবে ডায়াবেটিসের ফলে পায়ের ঘা, এমনকী পায়ের আঙুল ও পুরো পা বাদ দেবার ঘটনাও।

চিত্র ১. ডায়াবেটিসে পায়ের যত্ন খুব জরুরি

আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। ইন্টার্নশিপের সময় ইমার্জেন্সিতে একটি রোগীকে দেখি, তাঁর দু-টি পায়ের হাঁটুর নীচের অংশ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, বিশ্রী রকম গন্ধ। ইথার ঢেলে ক্ষত থেকে পোকা বের করে আনা হয়। রোগীর বাম পায়ের দু-টি আঙুল আগেই বাদ দেওয়া হয়েছে। রোগীর কাছেই শুনলাম, তাঁর ডায়াবেটিস আছে, নিয়মিত ওষুধ খান না। পরেও কয়েকবার ড্রেসিং ওটিতে তার ড্রেসিং করে দিয়েছিলাম। কয়েকদিন পরে আমার সার্জারিতে ডিউটি শেষ হয়ে যায়। পরে শুনি রোগীর বাম পায়ের পাতা ও গোড়ালির উপরের কিছুটা অংশ বাদ দিতে হয়—রক্ষা করা যায়নি। এটা তো একটি রোগীর কাহিনি। তাঁর জীবনে ডায়াবেটিস নামক রোগটি অযত্নের ফলে কতটা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে এটি তার একটি উদাহরণ। এরকম অজস্র উদাহরণ আছে যাঁদের পায়ের কোনো অংশ ডায়াবেটিসে নষ্ট হয়ে গেছে এবং যাঁরা বাকি জীবনের জন্য একরকম বিকলাঙ্গতাকে সঙ্গে নিয়ে চলেন। ডায়াবেটিস থাকলে অঙ্গহানির সম্ভাবনা ১৫ থেকে ৪০ গুণ বেড়ে যায়।

> ডায়াবেটিস থাকলে অঙ্গহানির সম্ভাবনা ১৫ থেকে ৪০ গুণ বেড়ে যায়।

কেন ক্ষত হয়?

ডায়াবেটিসে রক্তজালিকার প্রাচীরে চর্বি জমে রক্তজালিকা ক্রমশ সরু হতে থাকে। রক্ত আমাদের শরীরে কলাকোষে অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহ করে। রক্তচলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় স্নায়ুগুলি কাজ করতে পারে না। সাধারণত হাঁটুর নীচ থেকে পায়ের পাতা এবং কনুই থেকে হাতের তালু—এই অংশের স্নায়ুগুলি বেশি ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। ফলে এই জায়গা-গুলিতে অনুভূতি কমে যায়। এর সঙ্গে পা ভারী ভারী মনে হওয়া, সুঁচ ফুটছে এই রকম অনুভূতি, রাত্রিবেলায় পায়ের পাতায় ব্যথা—এসবই ডায়াবেটিসে স্নায়ুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ। এছাড়াও পায়ের ত্বকের আর্দ্রতা ও 'ইলাস্টিসিটি' কমে যায়। হাঁটাচলার সময় সামান্য আঘাতে বা পায়ের কোনোরকম গঠনগত অসাম্যে ত্বকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে জীবাণুদের বেড়ে ওঠার আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়, ফলে যেকোনো ঘা সারতে স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি সময় লাগে। এরই সঙ্গে ব্যথার অনুভূতি কম থাকায় একই ক্ষত বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও গভীর হতে থাকে। সাধারণত পায়ের পাতায় বা পায়ের পাতার উপরিভাগের ত্বকে ঘা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ত্বকের ক্ষত বা আলসার গভীর হলে সংক্রমণ হয় ও সেই সংক্রমণ সহজেই আরও গভীরে, এমনকী পায়ের হাড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। একে অস্টিয়োমায়লাইটিস বলা হয়। জ্বর, বমি, বমিভাব, আক্রান্ত স্থানে ব্যথা, লাল হয়ে যাওয়া, হাড়ের চারিদিকে ফুলে যাওয়া, সংলগ্ন গাঁটের (অস্থিসন্ধি) নাড়াচাড়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া—এ সবই অস্টিয়োমায়লাইটিসের লক্ষণ।

ডায়াবেটিসে গ্যাংগ্রিন

শরীরের কোনো অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে সেই অংশের কোষগুলির মৃত্যু ঘটে—একে গ্যাংগ্রিন বলে। ডায়াবেটিসে পায়ের ক্ষত বিনা চিকিৎসায় থাকলে তা বাড়তে থাকে ও শেষ পর্যন্ত গ্যাংগ্রিন হতে পারে, এই গ্যাংগ্রিন দুই প্রকারের হয়—

১. রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া ও একই সঙ্গে জীবাণু সংক্রমণ—

এ দুটোই ঘটলে সেই অংশটি ফুলে যায়, অসাড় হয়ে পড়ে। বর্ণহীন দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। একে ওয়েট গ্যাংগ্রিন বলে—বাংলায় বলতে পারি 'ভিজে গ্যাংগ্রিন'।

২. অন্যদিকে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া—অংশটি অসাড় হয়ে যায়, চামড়া কালো ও শুকনো হয়ে শুকিয়ে যায়—একে ড্রাই গ্যাংগ্রিন (শুকনো গ্যাংগ্রিন) বলে। ডায়াবেটিসে এই ধরনের গ্যাংগ্রিন বেশি দেখা যায়। ডায়াবেটিসে সাধারণত পায়ের বা হাতের আঙুল রক্ত চলাচলের অভাবে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে রক্ত চলাচল ফিরিয়ে এনে কোষকলার মৃত্যু আটকানো যেতে পারে। না হলে, মৃত অংশ বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

চিত্র ২. ডায়াবেটিসের ফলে পায়ের তলায় ঘা

কাদের ঘা হয়?

ডায়াবেটিস রোগে যাদের ক্ষেত্রে পায়ের আলসার বা পরবর্তীকালে অঙ্গহানির ঝুঁকি বেশি তা হল— ১. পুরুষদের ক্ষেত্রে, ২. রোগীর বয়স ৫৫ বছরের বেশি, ৩. ১০ বছরের বেশি সময় ধরে ডায়াবেটিস, ৪. ধূমপান, ৫. স্থূলত্ব (BMI-২৫-এর বেশি), ৬. হাইপারটেনশন (উচ্চ রক্তচাপ), ৭. রক্তে দীর্ঘ সময় ধরে মাত্রাতিরিক্ত গ্লুকোজের উপস্থিতি, (অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত বেশি ডায়াবেটিস) ৮. ডায়াবেটিস -জনিত চোখের সমস্যা, ৯. নখের কোনো সমস্যা, ১০. ত্বকের কোথাও সূক্ষ্ম ক্ষত (fissure), ক্রমাগত আঘাতে কোথাও ত্বক শক্ত হয়ে যাওয়া (ক্যালাস), ১১. পায়ের পাতার ধমনিতে পালসের অনুপস্থিতি, ১২. ডায়াবেটিসজনিত স্নায়ুর সমস্যার উপস্থিতি।

চিত্র ৩. যথাযথ চিকিৎসায় পায়ের ঘা সারে

প্রতিরোধে পদক্ষেপ

ডায়াবেটিক ফুটের অন্যতম একটি লক্ষণ ব্যথার অনুভূতি কমে যাওয়া; ফলে পায়ের ছোটো ছোটো আঘাত বা ক্ষত সম্পর্কে রোগী উদাসীন থাকেন। এখানে একজন স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের কাজ হল রোগীকে 'ডায়াবেটিক ফুট'-এর বিভিন্ন লক্ষণ ও তার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা। ডায়াবেটিসে পায়ের নানা সমস্যা প্রতিরোধ করার বিভিন্ন উপায়গুলি হল:

১. রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, ওষুধ নেওয়া, খাবারের তালিকা অনুযায়ী খাদ্যাভ্যাস, ওজন কমানো ইত্যাদির মাধ্যমে তা করা যায়।

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে পায়ের ত্বক আর্দ্র রাখতে হবে। ইলাস্টিক মোজা পরা চলবে না, তা রক্ত চলাচল ব্যাহত করতে পারে। সুতির বা উলের মোজা ব্যবহার করতে হবে।

২. অন্যান্য রোগ যেমন—হাইপারটেনশন, রক্তে চর্বির পরিমাণ বৃদ্ধি, পায়ের গঠনগত সমস্যা ইত্যাদির যথাযথ চিকিৎসা দরকার।

৩. রোগীকে প্রতিদিন পা, পায়ের আঙুলের খাঁজগুলো পরিষ্কার করতে হবে। যেকোনো আঘাত এড়িয়ে চলতে হবে। কোনোরকম আঘাতের পর পায়ে কোথাও কেটে গেছে বা আঁচড় লেগেছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে পায়ের ত্বক আর্দ্র রাখতে হবে। ইলাস্টিক মোজা পরা চলবে না, তা রক্ত চলাচল ব্যাহত করতে পারে। সুতির বা উলের মোজা ব্যবহার করতে হবে।

৪. রোজ নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

৫. ধূমপান বন্ধ করতে হবে, কারণ তা ডায়াবেটিসজনিত রক্ত- জালিকার ক্ষতিকে বাড়িয়ে দেয়।

৬. সবসময় নেলকাটার ব্যবহার করতে হবে। নখ কাটার সময় আমরা সাধারণত নখের সামনের দিকটা গোল করে (convex বা উত্তল) কাটি। ডায়াবেটিস রোগীদের নখ কাটা উচিত উলটো করে অর্থাৎ সামনের দিকটা হবে অবতল (concave) । নখের কোণায় ইনফেকশন বা নখের যাবতীয় সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৭. ঠিকঠাক মাপের নরম জুতো ব্যবহার করতে হবে। টাইট জুতো, যা থেকে পায়ের কোনো অংশে একটানা চাপ পড়ে, সেই রকম জুতো পরা চলবে না। মাইক্রোসেলুলার রবারের মতো (MCR footwear) এক্ষেত্রে আদর্শ। যাদের ক্ষেত্রে পায়ের গঠনগত অসাম্য রয়েছে (যেমন ফ্ল্যাট ফুট বা হ্যামার টো (flat foot, hammer toe) তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে জুতো তৈরি করে পরতে হবে।

চিত্র ৪. ডায়াবেটিস রোগীর জুতোর সোল তৈরি সহজ নয়

রোগীর নিজের কিছু অনুভূতি ডায়াবেটিসজনিত ক্ষতর পূর্বলক্ষণ হতে পারে; চিকিৎসক অবশ্যই সে ব্যাপারে রোগীকে জিজ্ঞাসা করবেন। রোগীর পায়ের পাতা ভারী মনে হওয়া, দুই পায়ের অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য, পায়ের পেশিতে ব্যথা যা অল্প একটু হাঁটলে হয় এবং বিশ্রাম নিলে সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়; পায়ের ফোলা, দু-পায়ের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য—এই সব লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। যারা ডায়াবেটিক ফুটের ফলে কখনো ক্ষত বা অঙ্গহানি বা গ্যাংগ্রিন-এর শিকার হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে পায়ের যত্ন নেওয়া অত্যাবশ্যক।

ডায়াবেটিসে রোগীরা এবং অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরাও চোখ ও কিডনির সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকেন, কিন্তু দেখা গেছে প্রতি তিনজন ডায়াবেটিস রোগীদের মধ্যে একজন পায়ের আলসার বা ক্ষত সংক্রান্ত সমস্যায় ভোগেন।

রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই সচেতন থাকলে ডায়াবেটিক ফুটের চরম পরিণতিগুলি রোধ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ঠিকঠাক মাপের নরম জুতো ব্যবহার করতে হবে। টাইট জুতো, যা থেকে পায়ের কোনো অংশে একটানা চাপ পড়ে, সেই রকম জুতো পরা চলবে না। যাদের ক্ষেত্রে পায়ের গঠনগত অসাম্য রয়েছে তাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে জুতো তৈরি করে পরতে হবে।

ডা. নিবেদিতা, এমবিবিএস, কলকাতার একটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে হাউসস্টাফ।

সমাধান

✠	✠	১ স	✠	✠	২ এ	গ	✠	✠	৩ ই	কো
✠	৪ চি	কে	ন	৫ প	ক্স	✠	৬ ভা	টি	গো	✠
৭ রি	কে	ট	✠	টা	✠	৮ ব্বা	ই	✠	✠	✠
✠	ন	✠	✠	৯ সি	১০ টি	✠	১১ রা	গী	✠	✠
১২ ডে	ঙ্গু	✠	১৩ ডা	য়া	বি	১৪ টি	স	✠	১৫ এ	ন
✠	নি	✠	১৬ হ্য	ম	✠	টে	✠	✠	ই	✠
১৭ ব্যা	য়া	ম	✠	✠	✠	না	✠	১৮ রে	চ	ন
✠	✠	✠	১৯ সা	ই	২০ না	স	✠	✠	আ	✠
২১ ট	✠	২২ স	য়া	✠	সা	✠	২৩ স	✠	২৪ র	ক্ত
২৫ ক	২৬ পা	র	টি	✠	✠	২৭ ও	বে	২৮ সি	টি	✠
✠	ন	✠	২৯ কা	র্বা	ঙ্ক	ল	✠	টি	✠	✠

বুকের ব্যথার ব্যাবসা

১৫ ডিসেম্বর ২০১৬, মহাবোধি সোসাইটি হলে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* আয়োজিত 'ডা. পার্থসারথী গুপ্ত স্মারক বক্তৃতা' দিয়েছিলেন **ডা. গৌতম মিস্ত্রী**। বক্তৃতার শিরোনাম 'বুকের ব্যথার ব্যাবসা'। সেই বক্তৃতার মূল কথাগুলো পত্রিকার পাতায় রাখা হল।

নমস্কার সুধীবৃন্দ, আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ—*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক নিরলস কর্মকাণ্ডে শামিল হওয়ার জন্য। রোগভোগের ব্যয়বহুল, অসফল ও জটিল চিকিৎসার চেয়ে সুস্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়াস যে বেশি ভালো সেটা আমরা সবাই জানি। জানি কিন্তু কম মানি। এই কম মানি বলেই ভালো থাকার আসল রহস্য শোনায় আমাদের ইচ্ছে কম। ভালো থাকার কলাকৌশল সহজ সরল বলে সেটায় চটক নেই। ভালো থাকার খবরাখবর খবরের কাগজের শিরোনাম হয় না। আর সেই চটকছাড়া কথাগুলোই আজ আমি বলব।

সুস্থ থাকার বিজ্ঞানসম্মত, মানবিক ও সবার জন্য প্রয়োগ করার মতো পথের দিশা দেখানোর কাজে নিয়োজিত এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের আমার শুভেচ্ছা। এদের সঙ্গে আমি হাজার মাইল হাঁটতে রাজি। ক্লান্তিহীন ভাবে।

আমার নিবেদন বুকের ব্যথার চিকিৎসার অনৈতিক ব্যাবসার বিরুদ্ধে।

আমার (বুকের) ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে।
তখন মুচকি হেসে নল ফুঁড়ে দেয়
ডাক-তারে

বুকে ব্যথা হলে আমরা সব্বাই ভয় পাই . . .

বুকে ব্যথা হলে আমরা সব্বাই ভয় পাই। অম্বলের বড়ি, গরম জল ইত্যাদি একের পর এক টোটকা চলতে থাকে। গভীর রাতের বুকের ব্যথাকে হার্টের রোগ বলে আমরা প্রাথমিকভাবে ভাবতে ভয় পাই। মনের দুশ্চিন্তা আমরা অ্যান্টাসিডের প্রলেপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই। কিন্তু এইখানে অধমের দুইখানা কথা আছে। কারণ বুকের ব্যথার সত্যি কারণটা প্রকাশ পাবেই। মাঝরাত বলে বা আপনি স্পেশাল বলে প্রকৃতির নিয়মটা আপনার ক্ষেত্রে পালটে যাবে না।

তা কথা দুটো কী? আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। বুকের ব্যথা হার্টের রোগের কারণে হতে পারে অথবা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে। ব্যস। এইটুকু বিশ্লেষণই যথেষ্ট। অর্থাৎ আমার নিবেদন এই যে, বুকের ব্যথার কারণ হার্টের রোগ না হলে আমি আপনি আরাম করে ঘুমোতে যেতেই পারি। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বুকের ব্যথা অম্বলের দাওয়াইতে কমে গেল মনে হলেও সেটা হার্টের রোগ হতেও পারে, এই কথাটাও ভাবতে হবে।

মুশকিল হচ্ছে, বুকের ব্যথার আসল কারণ চটজলদি কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার সম্ভাবনা বড়ো কম। চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনও তার শৈশবে। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মস্তিষ্ক যে জটিল বিশ্লেষণের কাজটা করে, সেই কাজটা মেশিন দিয়ে আমেরিকাও করিয়ে উঠতে পারেনি।

বুকের ব্যথার কারণ নির্ণয়ের ধাপগুলো যতটা 'অবজেকটিভ' বা ব্যক্তিগত ধারণার প্রভাব মুক্ত, তার চেয়ে অনেকটা বেশি 'সাবজেকটিভ' বা ডাক্তারের ব্যক্তিগত ধারণা নির্ভর। অর্থাৎ, পরীক্ষার ফল বিচার করে যাই হোক না কেন, শেষ কথা বলবে ডাক্তার। এতে রোগনির্ণয়ের দোষত্রুটি থাকার সম্ভাবনা যেমন থাকতে পারে তেমনই ইচ্ছাকৃত স্বার্থ মেটানোর জন্য মিথ্যের মিশেলও থাকতে পারে। এখানে নিয়ম, নীতি আর আইনের ফাঁকফোকর থেকে যায় বিস্তর।

ধরুন, একজন মানুষের হয়তো বুকের খাঁচার হাড়ের ব্যথা হয়েছে, কস্টোকনড্রাইটিস (costochondritis) এবং সেটা বুঝতে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। যেহেতু, তর্কের খাতিরে হার্টের রোগে ই.সি.জি. ইত্যাদি প্রাথমিক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল নিরীহ হলেও ১০০% নিশ্চয়তা নিয়ে হার্টের রোগ নেই এটা বলা যায় না, তাই কোনো চিকিৎসক ব্যাবসায়িক কারণে এই costochondritis-কে মিথ্যে করে হার্টের রোগের তকমা এঁটে চিকিৎসার প্রহসন চালিয়ে গেলে তাকে সহজে ঠেকানো মুশকিল। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে চিকিৎসকের শুভবুদ্ধির উপর ভরসা করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। একটা উদাহরণ নিবেদন করলে প্রসঙ্গটি সহজে বোঝাতে পারব। এমন সমস্যার মুখোমুখি ডাক্তারদের প্রায় প্রতিদিনই হতে হয়।

যেমন ধরুন ৫৭ বছরের এক ব্যাঙ্ক কর্মীর এক বর্ষার রাতে বুকে ব্যথা শুরু হল। ব্যথাটা অসহ্য নয়, আর তেমন মারাত্মক বলেও মনে হল না। তবুও সম্পূর্ণভাবে চিন্তামুক্ত হবার জন্য এই বয়সের বুকের ব্যথায় একটা ই.সি.জি. করে নেওয়াটা দরকার, যদিও ই.সি.জি. সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও হার্টের রোগের কারণে বুকের ব্যথা হতে পারে। সে যাই হোক, অনেকের মতো এই ব্যক্তিটিরও আবার সরকারি হাসপাতালে যেতে ইচ্ছে হল না। আলিপুরের এক প্রাচীন বেসরকারি হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগে গেলেন ই.সি.জি. করে নিশ্চিন্ত হতে। এই হাসপাতালগুলোতে যে জুনিয়র ডাক্তাররা রাতের পাহারায় থাকেন, তাদের চাকরি বজায় রাখতে হলে

> রোগীকে ভর্তি না করে এমনিই ছেড়ে দিলে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়।

এমন রোগীকে ভর্তি না করে এমনিই ছেড়ে দিলে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। অতএব ই.সি.জি. না করে তাঁকে আই.সি.সি.ইউ.-তে ভর্তির জন্য চাপ দেওয়া হল। বেচারা রোগী ওখান থেকে পালিয়ে কলকাতার সবচেয়ে বড়ো সরকারি হাসপাতালে গেলেন। ততক্ষণে অবশ্য তাঁর বুকে আর ব্যথা

নেই। সরকারি হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার তৎক্ষণাৎ ই.সি.জি. করে, হার্টের রোগ নেই বলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। দীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টার টানাপোড়েন পাঁচ মিনিটে মিটিয়ে দেবার ব্যাপারটা ভদ্রলোকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। তিনি পরের দিন সকালে টাকাপয়সা ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি জোগাড় করে চিড়িয়াখানার সামনে এক নামকরা হার্টের রোগের হাসপাতালে ঢুকে পড়লেন। ওখানে ফস করে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি পরীক্ষা হয়ে গেল। পরীক্ষা করতে করতেই হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করলেন হার্টে ব্লক আছে, বাঁচতে হলে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করতে হবে সত্বর। খরচের বহরটা শুনে সত্যি হার্ট অ্যাটাক হবার উপক্রম। খুঁজে পেতে অফিস কলিগের চেনাজানার সূত্র ধরে পৌঁছে গেলেন আর একটা বেসরকারি হাসপাতালে। এটাতে খরচপাতি কম হবার সম্ভাবনা। ওখানে আবার অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করতে হল। দু-দুটো ব্লক আছে এটা আবার জেনে ভদ্রলোক এবার ঘরে ফিরলেন। ওখানে ওনাকে বাইপাস অপারেশন করতে নিদান দিয়েছিল। এই ঘটনাটা সাত বছর আগের। অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশন-এর কোনোটা না করেই উনি ৬৪ বছর বয়সে এ বছরে কেদার-বদ্রি ঘুরে এসেছেন। এখন রোজ সকালে ৫ কিলোমিটার করে হাঁটেন। আসলে এ ক্ষেত্রে ওনার বুকের ব্যথার কারণ হৃদ্‌রোগ ছিল না। বুকের খাঁচার ব্যথা ছিল, যেটা সদ্য পাশকরা জুনিয়র ডাক্তারেরও বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। বুকের ব্যথার স্থানে আঙুল দিয়ে অল্প চাপ দিতেই উনি ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। হার্টের রক্তনালীতে নির্ণীত ব্লকটি চুপিসারে বাড়ছিল। এই ব্লক খুঁচিয়ে, চেপেচুপে সামান্য মেরামত করা যায়

রোগী হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে না চাইলে সহজে ছুটি মেলে না।

বটে, তবে তাতে কোনো সুবিধা হয় বলে প্রমাণ নেই। বরং এই ক্ষেত্রে সুস্থ জীবনশৈলী ও ওষুধের চিকিৎসাই সর্বোত্তম।

কী? চিকিৎসা করাবেন না? রোগী হাসপাতালে চিকিৎসিত হতে না চাইলে সহজে ছুটি মেলে না। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়াও এক দুরূহ ব্যাপার। ব্যাপারটা এইরকম, রোগী যেন জেলখানায় বন্দি। অনুনয় বিনয় করে, আর্থিক অক্ষমতার কথা নিবেদন করে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়াটাও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এক বিশাল দয়া বলে মনে হয়।

কী চিকিৎসা হল হাসপাতালে? সরকারি হোক বা বেসরকারিই হোক না কেন, হাসপাতালের ডিসচার্জ সামারিতে কিছু দুর্বোধ্য শব্দ বিজাতীয় ভাষায় লেখা থাকে। এক ডাক্তারের লেখা সেই সাংকেতিক ভাষা অন্য ডাক্তাররাই বুঝতে পারেন না, সাধারণ মানুষের বোঝা তো দূরের কথা।

ব্যাঙ্গালোরে দ্বিতীয় মতামত দেবার চিকিৎসকদের সংস্থা আছে। মুম্বাইতে চালানো এক সমীক্ষামতে, ১২৫০০ জন রোগীকে অপারেশন করার অভিমত দেয়ার পরে দ্বিতীয় মত নেওয়া হয়েছিল। সেই মত অনুযায়ী তাদের মধ্যের ৪৪ শতাংশের অপারেশনের প্রয়োজন নেই। (http://timesofindia.indiatimes.com/india/44-advised-unnecessary-surgery-2nd-opinion-givers/articleshow/45746903.cms) অপর একটি সমীক্ষামতে ভারতবর্ষে যত অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি ও হার্টের বাইপাস অপারেশন করা হয় তার শতকরা ৫৫ শতাংশই অপ্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। এই সংখ্যাগুলো যথেষ্ট উদ্বেগের বটে।

ছলচাতুরী

আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'ই.সি.জি.' সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও হার্টের রোগের কারণে বুকের ব্যথা হতে পারে। বুকের ব্যথা হার্টের রোগের জন্য না অন্য কারণে, এ নিয়ে সত্যিকারের মতপার্থক্য এবং ছলচাতুরী সম্ভব হয় হার্টের রোগের আরও দুটো বৈশিষ্ট্যের কারণে। প্রথমত, আপাত সুস্থ ব্যক্তির, যার বুকে ব্যথা নেই বা আপৎকালীন চিকিৎসারও দরকার নেই, তাদের হার্টের রক্তনালী আংশিক সরু (ব্লক) থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগের কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু পরীক্ষায় রোগলক্ষণ ধরা পড়ছে। এটাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'False positive' বা ভুল রোগলক্ষণ বলা যেতে পারে। হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তনালী সরু হয়ে গেলেই সেই অবস্থাকে বুকের ব্যথার কারণ বলে মনে করে নেওয়া যাবে না। সেই ক্ষেত্রে ওই সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালীকে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে মেরামত করা অথবা বাইপাস অপারেশন করে নেওয়া অর্থহীন। দ্বিতীয়ত কোনো ডাক্তার তার চিকিৎসাধীন রোগীর হার্টের রোগ নেই জেনেও যদি সংশয় দূর করার ছলে কিঞ্চিৎ টাকা পকেটস্থ করেন তবে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। কারণ ডাক্তারের মনের কোণের গোপন কথার হদিশ কীভাবে পাওয়া যাবে? তিনি যেটা ব্যক্ত করছেন বা অভিনয় করছেন, কেবল সেটারই হিসেব নেওয়া যাবে।

একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বুকের ব্যথা নিয়ে হাসপাতালের ইমারজেন্সি বিভাগের দ্বারস্থ হলে তাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১.৫ শতাংশের বুকের ব্যথার কারণ হার্টের রোগের কারণে হয়। (Klinkman MS, Episode of care for chest pain: a preliminary report from MIRNET, Michigan Research Network: J Fam Pract 1994: 38(4):345) আমি বা আপনি ওই কারণে হাসপাতালে গেলে আমরা ওই ১.৫ শতাংশের মধ্যে পড়ছি নাকি বাইরে, সেটা নির্ণয় করা ডাক্তারের কাজ।

বুকের ব্যথার কারণ হার্টের রোগ না হলেও কীভাবে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি, বাইপাস অপারেশন, অথবা নিদেনপক্ষে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটের জেলখানায় বন্দি রেখে অনৈতিক ব্যাবসা চলে, সব জেনেশুনেও রোগী ও তার আত্মীয়-পরিজন অসহায়ভাবে মেডিক্যাল মাফিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন আর সবশেষে ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে কীভাবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব তার রূপরেখা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। তবে তার আগে একটা সাফাই গেয়ে নেওয়া দরকার। এই চিত্রের একটা উলটোপিঠও আছে।

উলটো পিঠ

এটা একটু আগেই বলেছি, আপাত দৃষ্টিতে বুকের ব্যথা অম্বলের দাওয়াইতে কমে গেলে মনে হলে সেটাও যে হার্টের রোগ হতেও পারে এই কথাটাও ভাববার বিষয় বটে। যেমন অভিজ্ঞতা আমার কর্মজীবনের শুরুর দিকে ঘটেছিল। একদিন আমি রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরলে প্রতিবেশী প্রবীণ চিকিৎসক আমাকে তলব করলেন ই.সি.জি. মেশিন নিয়ে

তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য। ওনার বুকের ব্যথার চিকিৎসা প্রায় উনি নিজেই মিটিয়ে ফেলেছিলেন অ্যান্টাসিডের বড়ি ও এনজাইমের আরক গিলে। ই.সি.জি. করতে নেহাত নিয়মরক্ষার জন্য আমাকে ডাকা। ই.সি.জি. করে ওনার হার্ট অ্যাটাক রোগ নির্ণয় করতে আমার পাঁচ মিনিট লাগল। উনি হাসপাতালে ছুটলেন। প্রবীণ চিকিৎসক এরপর তিনদিন মাত্র বেঁচে ছিলেন। হার্ট অ্যাটাকের পরে চটজলদি চিকিৎসা চালু না হলে এমনটা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয় মোটেই। অর্থাৎ, বুকের ব্যথা মামুলি বলে মনে হোক বা বেশ দুশ্চিন্তারই হোক না কেন, একজন প্রশিক্ষিত ও সৎ হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞের অন্তিম মতামতের বিকল্প কিছু নেই।

বুকের ব্যথার কারণে কেউ সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালের আপৎকালীন পরিষেবার দ্বারস্থ হলে বর্তমান চিত্রটা একই চলচ্চিত্রের রিপ্লের মতো। এই বুকের ব্যথা হার্টেরও কারণে হতে পারে এই আতঙ্ককে মূলধন করে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি পরীক্ষা এখন প্রথাগত কু-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এটা আর যাই হোক চিকিৎসাবিজ্ঞান নয়। কথায় কথায় ধাঁ করে পরীক্ষানিরীক্ষা করার আগে চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগলক্ষণ বিশ্লেষণ, তার পরে শারীরিক পরীক্ষা ও প্রাথমিক পর্যায়ের ল্যাবরেটরির পরীক্ষা করার কথা। এখনও মেডিক্যাল পাঠক্রমে হবু ডাক্তাররা প্রশিক্ষিত হন এই জেনে ও বিশ্বাস করে যে, রোগভোগের শতকরা ৮০ শতাংশ নিশ্চয়তা নিয়ে রোগনির্ণয় এই প্রাথমিক পর্যায়ের মূল্যায়নেই সম্ভব। প্রথিতযশা দিকপাল ডাক্তারগণ এই গুণের জন্যই উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছে থাকেন। চিকিৎসা পরিষেবা যবে থেকে বেশি করে ক্রয়যোগ্য হয়েছে, তবে থেকে বিজ্ঞানের আঙিনা থেকে ব্যাবসা, মুনাফা আর অনৈতিক বাজারে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রবেশ করেছে। অবশ্য এটা যে কেবল চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রেই হয়েছে এমনটি নয়। কিন্তু একটা বড়ো ফারাক আছে। অন্যান্য পরিষেবা বা ভোগ্যবস্তুর ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ যাচাইয়ের নির্ভরযোগ্য নিয়ন্ত্রক আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই নিয়ন্ত্রণ ক্ষীণ ও অসফল।

চিকিৎসকের সততার কাছে আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই

দোকান-বাজারে ভোগ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারি দপ্তর আছে, আর্থিক লেনদেন সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা আইন আছে। বুকের ব্যথায় ডাক্তারবাবু অকারণে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি-অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি-বাইপাস অপারেশন ইত্যাদি করে ফেললে কেমন করে আটকাবেন? লাখে এক-দু-জনের বুকের ব্যথার সঠিক চিকিৎসা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা বাইপাস

> ইঞ্জেকশন দিলে সাধারণত সারা শরীরেই ওষুধটা ছড়িয়ে পড়ে, মলমে কেবল দরকারের জায়গায়।

অপারেশন হলেও আর সেটা নির্ণয় করার হালকা-ফুলকা নির্দেশিকা থাকলেও সেখানে চিকিৎসকের অসৎ স্বাধীনতা(?) নিয়ন্ত্রণ করার মতো জোরালো দিশা বৈজ্ঞানিকরা এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অর্থাৎ ১০০ শতাংশ নিশ্চয়তা নিয়ে চিকিৎসকের অসততাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতির নির্দেশক মজুত নেই। এই মুহূর্তে চিকিৎসকের সততার কাছে আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই। আর চিকিৎসকের সততা তো বাইরে থেকে আমদানি করা কোনো মানবিক গুণ নয়। সেটা এই সামাজিক পরিমণ্ডলেরই নির্মাণ। এই মুহূর্তে কেবল রোগী-উপভোক্তার সচেতনতার আর প্রতিক্রিয়ার উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো পথ দেখি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না চিকিৎসা পরিষেবা বাণিজ্যায়নের কবল থেকে মুক্ত হচ্ছে। এবার একটু টেকনিক্যাল বিষয়ে আসি।

করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম একটি পরীক্ষা। হৃদ্‌পেশির বাইরের গায়ে লেপটে থাকা অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বহনকারী রক্তনালী বা ধমনির সুস্থতার পরীক্ষা। ওই বিশেষ ধমনিগুলোর নাম করোনারি আর্টারি। কুঁচকি বা কবজির রক্তনালী ফুটো করে একটা লম্বা ফাঁপা ও সরু নল (ক্যাথিটার) ঢুকিয়ে দিয়ে করোনারি আর্টারির উৎসমুখে তরল ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয়। এক্স-রে করে ওই তরলকে রক্তনালীর মধ্যে দেখা যায়। এক্স-রে দিয়ে সিনেমার চিত্রগ্রহণের মতো করে ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। ব্যস এটাই 'করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি' পরীক্ষা আর ভিডিও রেকর্ডিংটি হল 'করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম'। করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রামের চলমান চিত্রতে স্বাভাবিক করোনারি ধমনির রক্তের স্রোত কালো রেখাচিত্রের এক চলমান বিন্যাস তৈরি করবে। হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ এই স্বাভাবিক বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত থাকেন। করোনারি আর্টারির কোনো ক্ষুদ্র অংশ সরু হয়ে গেলে, যেটাকে কিনা আমরা ব্লক বলে উল্লেখ করে থাকি, করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রামের চলমান চিত্রতে সেই অংশকে সরু ও অসমান দেখাবে। মোদ্দা কথা, করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম নামক পরীক্ষার মাধ্যমে করোনারি আর্টারির ব্লক অর্থাৎ সরু হয়ে যাওয়া রোগগ্রস্ত অংশ নির্ণয় করা হয়। এই পরীক্ষাটাকে হৃদ্‌রোগের (করোনারি আর্টারি ডিজিস) অস্তিত্ব নির্ণয়ের অন্তিম ও সর্বোত্তম মাপকাঠি হিসাবেও ধরা হয়।

আমাদের হৃদয়ে তিনটি প্রধান করোনারি আর্টারি তার শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে হৃদ্‌পেশিতে রক্ত সরবরাহ করে। সাধারণত করোনারি আর্টারি কখনো পুরোটা সরু হয়ে যায় না। করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করার পর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম দেখে করোনারি আর্টারিতে ব্লকের সংখ্যা, করোনারি আর্টারিতে ব্লকের অবস্থিতি (উৎসমুখের কাছে না দূরে) ব্লকের দৈর্ঘ্য ও তার সম্ভাব্য ভৌত অবস্থা (নরম না শক্ত, ভঙ্গুর না স্থিতিশীল ইত্যাদি) বোঝার চেষ্টা করা হয়। এই নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ আর প্রভাবের মিশেল থাকতে বাধ্য। ডিজিটাল মেশিনে একই রক্তের নমুনার সুগার মাপার সঙ্গে (যেটা কিনা সবসময়ই একই ফল দেবে, reproducible) এই মূল্যায়নের ফারাক আছে। আবার এটাও ভাবতে হবে, করোনারি আর্টারিতে ব্লক মানেই সেটা বুকের ব্যথার বা রোগীর অসুস্থতার কারণ নয়। এই যে বলা গেল, করোনারি আর্টারিতে ব্লক মানেই সেটা বুকের ব্যথার কারণ নয় বা মানুষটির ভবিষ্যতের সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনের নির্ণায়ক নয় সেই বক্তব্যের মধ্যেই বলা হয়ে গেল এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক কঠোর সত্যটা। আমরা এবারে এই বক্তব্যটা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নেব। করোনারি আর্টারিতে ব্লক না থাকা সুস্থতা হলে ব্লক থাকা অবস্থাটা করোনারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশনের দ্বারা মেরামত করে নিলে সুবিধা

কেন হবে না—এই আপাত পরস্পর বিরোধী অবস্থানটা জানা থাকে না বলেই অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি আর বাইপাস অপারেশনের মাধ্যমে ব্লক নির্মূল করার অনৈতিক ব্যাবসাটি রোগীদের ধোঁকা দিতে পারছে। এইবার আমরা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির অসফলতার কারণ নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে নেব।

হার্টের মধ্যে নল চালাচালি বা ''কার্ডিয়াকে ক্যাথেটারাইজেশন'' ১৯২৯ সালে আবিষ্কার হয়ে গেলেও (Werner Forssmann) করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রামের কলাকৌশল রপ্ত করতে আরও ৩১ বছর অপেক্ষা করতে হল (Mason Sones, 1960)। আরও ১৭ বছর পরে আন্ড্রেস গ্রেন্টজিগ সর্বপ্রথম মানুষের শরীরে করোনারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করেন (Andreas Gruentzig, San Fransisco and Zurich 1977)।

এরপর বুকের ব্যথার হৃদ্‌রোগজনিত কারণ নির্ণয় ও প্রদর্শনের কোনো অন্তরায় রইল না। শুধু তাইই নয়, জোয়ান-বুড়ো, বৈজ্ঞানিক-আমজনতা মনে করল হৃদ্‌রোগকে বোধহয় জয় করা গেল। কিন্তু তেমনটি হল না। বেলুন ফুলিয়ে হার্টের রক্তনালীর ব্লক চাপাচাপি করে রক্তনালীকে আপাতত মোটা করে দিলেও সেই ব্লক কেবল শীঘ্রই আগের অবস্থানে ফিরে এল না তাই নয়, তার ভয়াবতা হল আগের চেয়েও তীব্র। বৈজ্ঞানিকরাও হেরে যাবার পাত্র নন।

বৈজ্ঞানিকরা এবারে বেলুন ফুলিয়ে করোনারি আর্টারি মোটা করে একটা তারের খাঁচা দিয়ে ঠেকা দিয়ে দিলেন যেটাকে স্টেন্ট বলে। প্রথমের স্টেন্টগুলো ছিল নগ্ন তারের তৈরি (bare metal stent)। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের হতাশ করে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করা হৃদ্‌রোগীদের অধিকাংশের স্টেন্টের মধ্যে শীঘ্রই পুনরায় ব্লক সৃষ্টি হতে দেখা গেল। স্টেন্টের ধাতব পদার্থ রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে এবং অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করার

দুই ঘণ্টার মধ্যে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে স্টেন্ট প্রতিস্থাপন, যেটাকে 'প্রাইমারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি' বলা হয়, সেটাতে উপকার হয় এটা প্রমাণিত।

সময়ে ক্ষত সৃষ্টি করে। কিছুকাল পরে স্টেন্টের মধ্যে ক্ষত সারানোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার (epithelialiation) ফলস্বরূপ কোষকলার আবরণ তৈরি হয়ে স্টেন্টের মধ্যেকার করোনারি আর্টারি পুনরায় ব্লক হয়ে যাওয়াটা এক বিশাল সমস্যা হিসাবে দেখা দিল।

স্টেন্টের প্রকারভেদ

নগ্ন তারের তৈরি স্টেন্ট শীঘ্রই বাতিল বলে গণ্য হল, যদিও অপেক্ষাকৃত সস্তার বলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এগুলো এখনও ব্যবহার হয়ে থাকে। বিগত তিন দশকে স্টেন্ট প্রযুক্তি অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এসেছে। স্টেন্টের নগ্ন ধাতব তারের খাঁচায় বিভিন্ন ওষুধের প্রলেপ লেগেছে। স্টেন্ট লাগানোর পরে রক্তের জমাট বেঁধে যাবার প্রবণতাকে কমানোর জন্য রক্তের অণুচক্রিকার সক্রিয়তাকে নিষ্ক্রিয় করার ওষুধের মিশ্রণ প্রয়োগ করাও চলেছে। নতুন জেনারেশনের এই ওষুধগুলো আবার বেশ দামি। এই মুহূর্তের নবতম স্টেন্টগুলো ''বায়ো-অ্যাবজর্বেবল''—মানে শরীরের কোষকলা আত্মস্থ করে নেয়। এত করেও হৃদ্‌রোগীদের দীর্ঘমেয়াদি সুস্থতায় স্টেন্টের নবতম প্রযুক্তির উপযোগিতা প্রমাণিত নয়। একটু অতিশয়োক্তি করে ফেললাম। হার্ট অ্যাটাকের অব্যবহিত পরে প্রথম দুই ঘণ্টার মধ্যে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে স্টেন্ট প্রতিস্থাপন, যেটাকে 'প্রাইমারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি' বলা হয়, সেটাতে উপকার হয় এটা প্রমাণিত। কিন্তু এঁরা ছাড়া যে বিশাল সংখ্যক হৃদ্‌রোগীদের অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি ও অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করা হয়ে থাকে তাঁদের উপকার হয় এমন প্রমাণ নেই। বৈজ্ঞানিকরা ভাবতে থাকুন কেন উপকার হচ্ছে না। তবে আমরা উদ্বিগ্ন হব এই প্রযুক্তির যথেচ্ছ অপব্যবহার নিয়ে।

ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল

চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনও তার শৈশবে। যুক্তি দিয়ে যা সঠিক বলে ভাবি, তা শরীরে প্রয়োগ করলে কাজ হয় না অনেক সময়। তাই ''নিয়াসিন'' (niacin) নামক ওষুধটি হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধকারী ভালো কোলেস্টেরল (HDL Cholesterol) বাড়ালেও দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় ধরে ব্যবহার হবার পরে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিতে হয়। উচ্চমাত্রার গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধ করে। নিয়াসিন গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে সক্ষম হলেও তাতে সুবিধার বদলে ক্ষতি বেশি হচ্ছিল। এমন অনেক উদাহরণ অন্যান্য ওষুধবিষুধ আর চিকিৎসা প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সত্য। এই কারণে ওষুধ বা অন্যান্য চিকিৎসা প্রযুক্তি সাধারণ বুদ্ধিতে ও যুক্তিতে কাজের বলে মনে হলে সেটা প্রয়োগের আগে ''ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল'' নামে এক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তিনটি স্তরে ন্যূনতম সংখ্যার রোগীদের উপরে নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষানিরীক্ষায় ওষুধ বা অন্যান্য চিকিৎসা প্রযুক্তি সফল হলেই তবে সেটি মান্যতা পায়, বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র পায়।

ওষুধে কষ্ট লাঘব করা গেছে এমন ''ক্রনিক'' হৃদ্‌রোগে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি চিকিৎসা প্রযুক্তির জীবনের মান ও আয়ু বাড়াতে সক্ষম এমনটা কোনো বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ণায়ক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রমাণ করতে পারেনি।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নগ্ন তারের স্টেন্টের (bare metal stent) ওপরে ওষুধের প্রলেপ (drug-eluting stent) লাগিয়েছেন। অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির আগে ব্লকের মালমশলা যন্ত্র দিয়ে বের করে নিয়েছে, বিভিন্নভাবে রোগী বাছাই (fractional flow reserve) করে নিয়ে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে নিয়ে দেখেছেন ওষুধের চিকিৎসার চেয়ে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির সুবিধা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু স্টেন্ট-বিজ্ঞান প্রযুক্তি গবেষণাকে নিয়ন্ত্রণ করে স্টেন্ট ব্যাবসা। স্টেন্ট প্রযুক্তিও থেমে নেই, উন্নত দেশগুলিতে এর পরীক্ষানিরীক্ষার খামতি নেই। প্রতি বছর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তার আভাস মেলে। হয়তো-বা কোনো এক অদূর ভবিষ্যতে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি প্রযুক্তি কিঞ্চিৎ সফলতা অর্জন করবে। সেই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার হবার সম্ভাবনা বড়োই কম। ''প্রাইমারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির'' মুখোশের আড়ালে হার্ট অ্যাটাকের পরের দিন বা তারও অনেক পরে হাসপাতাল ও ডাক্তারের সুবিধা মতো সময়ে ও স্থানে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে নেওয়া হতে থাকবে, যেমনটি আকছার হয়ে থাকে আমাদের দেশে। হৃদ্‌রোগী ও সাধারণ নাগরিকের অজ্ঞতা এবং কিছু

অল্প-প্রশিক্ষিত অথবা অসৎ চিকিৎসকের চতুরতাই এই কুচিকিৎসার মূলধন।

ওষুধের চিকিৎসার চেয়ে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি ভালো, এমনটা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। বন্ধ রক্তনালী খুলে দেবার পরে হৃদ্‌রোগীদের ভালো কেন হচ্ছে না, অথবা কোনো কোনো সমীক্ষায় খারাপই বা হচ্ছে কেন এই প্রশ্নের উত্তরের কিছু দিশা অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে। এই সমালোচনার দুইটি দৃষ্টিকোণ আছে। প্রথমে আমরা করোনারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির আশানুরূপ ফল না হওয়ার সম্ভাব্য তাত্ত্বিক কারণ ও প্রায়োগিক কারণ সবগুলোই খতিয়ে দেখব।

তাত্ত্বিক কারণ

১. ছেঁড়া গেঞ্জিতে তালি মারলে টেকে না

প্রথমত করোনারি আর্টারির অসুখটা রক্তনালীর একটি সর্বাঙ্গীণ রোগ, রক্তনালীর বিশেষ গোনাগুনতি কয়েকটি স্থানের সমস্যা নয়। এটা অনেকটা পুরানো বাড়ির মরচে পড়া, জল লিক করা বাথরুমের পাইপের মতো। আজ একটি ফুটো মেরামত করে নিলে, শীঘ্রই অন্য জায়গায় পাইপের জীর্ণ দশা প্রকাশ পাবেই। রোগগ্রস্ত রক্তনালীর অসুখ হৃদ্‌পিণ্ডের, মস্তিষ্কের, কিডনির এমনকী পায়ের রক্তনালীকেও প্রভাবিত করে। এই সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের অসংখ্য স্থানে রক্তনালীর মধ্যে কোলেস্টেরল ও আনুষঙ্গিক পদার্থ জমে (অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাক) রক্তনালীর বহু অংশকেই সরু ও অস্থিতিশীল করে তোলে। যে সমস্ত স্থান অন্তত ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ সরু হয়ে যায়, সেই স্থানে রক্তচলাচল বুকের ব্যথা ও অন্যান্য কষ্ট উদ্রেক করার মতো রোগলক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়। যদি প্রাথমিক রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হিসাবে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লাকের বাড়বাড়ন্ত থামানো বা নিয়ন্ত্রিত করা না যায়, দু-একটা স্থানের সরু হয়ে যাওয়া রক্তনালী মেরামত করে আখেরে লাভ না হওয়ারই কথা।

২. মরা গাছের গোড়ায় জল ঢাললে গাছ বেঁচে ওঠে না

হার্ট অ্যাটাকের পরে সময়মতো রক্ত চলাচল পুনরায় চালু না হলে হৃদ্‌পেশির মৃত্যু ঘটে। ইস্কিমিক হৃদ্‌রোগে করোনারি ধমনির ব্লক বা বাধা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে রক্তচলাচল আবার চালু করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেটা করতে পারলেও রোগগ্রস্ত হৃদ্‌পেশির পুনরুজ্জীবন সম্ভব কিনা সেটার উপরে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির সফলতা নির্ভর করে। অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করার আগেই হৃদ্‌পেশির পুনরুজ্জীবন-সম্ভাবনা পরখ করে নেবার উপায় অবশ্য আছে (myocardial viability studies)। তবে সেই প্রথা চিকিৎসকদের কাছে প্রিয় নয়—বোধহয় অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করার সম্ভাবনা কমে যাবার ভয়ে আর ব্যাপারটা প্রচারও পায়নি। এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা পরিষেবা ও যথাযথ প্রশিক্ষিত প্রকৌশলীরও অভাব আছে। ব্লক হয়ে যাওয়া রক্তনালীর সম্মুখের হৃদ্‌পেশি পাকাপাকিভাবে মৃত হলে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা বাইপাস অপারেশন কোনো কাজে আসবে না।

৩. খুঁচিয়ে ঘা করা হচ্ছে না তো?

করোনারি অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি ও অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করার সময়ে হার্টের মধ্যে নল চালাচালির সময়ে নল (ক্যাথিটার) ও ''গাইড ওয়ার'' (যার ওপর দিয়ে নলটাকে সঠিক পথে চালনা করা হয়) রক্তনালীর আভ্যন্তরীণ দেওয়ালের আবরণকে খোঁচাখুঁচি করেই থাকে। আমরা জানি, হাঁটু ছড়ে গেলে যখন সেটা সারে সেখানের চামড়া মোটা হয়ে যায়; আগের মতো আর পাতলা থাকে না। রক্তনালীর মধ্যে ক্যাথিটারের খোঁচার ক্ষতের প্রতিক্রিয়ার ফলে হতে পারে আরও ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া। যে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ফলে এই হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি, এই খোঁচার ফলে সেই হৃদ্‌রোগকেই আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞের সন্দেহ।

৪. বন্ধুর বেশে শত্রু নয় তো?

স্টেন্টের খাঁচা রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে করোনারি ধমনির মধ্যে রক্তের ডেলা পাকানোর সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। ধাতব স্টেন্ট রক্তের ডেলা পাকানোর ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এই ভয়টার কথা জানাই ছিল। এজন্য স্টেন্ট বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই কমপক্ষে দু-রকমের রক্ত জমাট না বাঁধার ওষুধ ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। স্টেন্টের সংস্পর্শে রক্ত জমাট বেঁধে স্টেন্টের মধ্যে রক্ত চলাচলের রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই সমস্যা এতই বড়ো যে বিগত কয়েক বছর ধরে হৃদ্‌রোগের গবেষণার এক মুখ্যভাগ এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে। প্রতিবছর নতুন নতুন ওষুধের অনুসন্ধানে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ব্যস্ত আছেন যাতে স্টেন্ট প্রতিস্থাপনের পরে স্টেন্টের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে একে অকেজো না করে দেয়। এই ওষুধগুলো যত শক্তিশালী হবে, স্টেন্ট তত বেশিদিন ধরে কর্মক্ষম থাকবে। আমরা অ্যাসপিরিন ওষুধের কথা জানি। হৃদ্‌রোগীদের জন্য অ্যাসপিরিন একটি অত্যন্ত কাজের ও অপরিহার্য ওষুধ। স্টেন্ট প্রতিস্থাপনের পরে কেবল অ্যাসপিরিনে কাঙ্ক্ষিত সুরক্ষা মিলবে না। এর সঙ্গে একই সঙ্গে ব্যবহার করে যেতে হবে এর চেয়েও শক্তিশালী ও

হৃদ্‌রোগের সুরক্ষার সঙ্গে মেনে নিতে হবে বাড়তি সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা।

ব্যয়বহুল অণুচক্রিকা কমজোরি করে রাখার বড়ি। এর ফলে কেবল চিকিৎসার খরচই বেড়ে যাবে তাই নয়, মেনে নিতে হবে অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত ও মারাত্মক মস্তিষ্কে ও অন্যান্য অঙ্গে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা। অর্থাৎ হৃদ্‌রোগের সুরক্ষার সঙ্গে মেনে নিতে হবে বাড়তি সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা। করোনারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে স্টেন্ট প্রতিস্থাপনের পরে করোনারি ধমনির মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা ও তাঁর সমাধানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা এই মুহূর্তের স্টেন্ট প্রযুক্তির অন্যতম প্রতিবন্ধক।

প্রয়োগমূলক প্রমাণ (Clinical evidence)

ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল: নিয়াসিন ওষুধের উদাহরণ স্মরণ করা যাক। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি ও স্টেন্ট প্রতিস্থাপনের পক্ষে ও বিপক্ষে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক আর সঠিক প্রয়োগের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা বুঝে নেবার পরে চাই একাধিক নিরপেক্ষ ও নিয়ন্ত্রিত সমমাত্রার রোগে ভোগা হৃদ্‌রোগীদের উপরে প্রযুক্তির সফলতা প্রদর্শন। পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী করা এই কর্মকাণ্ডকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বলে। স্টেন্ট নির্মাতাদের দাক্ষিণ্যে এমন পরীক্ষানিরীক্ষার অভাব নেই, এখনও সংঘটিত হয়ে চলছে। বিগত দুই দশক ধরে যে দিকনির্দেশকারী ট্রায়ালগুলো করা হয়েছে তার মধ্যে ''MASS II'', ''COURAGE'', ''BARI 2D''

অন্যতম। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ১৭টি ট্রায়ালের তথ্যের সম্মিলিত বিশ্লেষণ (Meta-analysis) করা হয়েছে। এগুলোর মতামতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এই ট্রায়ালগুলোর মতে—হার্ট অ্যাটাক হয়েছে অথবা কেবল ক্রনিক ইস্কিমিক হার্টের রোগ হয়েছে এমন, ডায়াবেটিস অথবা ডায়াবেটিস নেই এমন এরকম সব রোগীদের কেবল ওষুধের চিকিৎসা, স্টেন্টসহ অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি অথবা বাইপাস অপারেশনের এক বছর পরে ও পাঁচ বছর পরের অন্তিম ফলাফলে কোনো উল্লেখযোগ্য ফারাক নেই। (J Am Coll Cardiol 2004; 43:1743-51, Meta-analysis by Schomig et al, N Engl J Med 2009; 360:2503-2515) স্টেন্ট নির্মাতাগণ ফি-বছর নতুন নতুন কেরামতির প্রযুক্তি পরিবেশন করে বলছে, এইটা আগেরটার চেয়ে ভালো। উপকার পেতে পারে এমন রোগীদের বাছাই করার নব নব পরীক্ষাও পেশ করছে (fractional flow reserve, FFR)। যুক্তি খাড়া করছে যে, ওই ট্রায়ালগুলো পুরানো জমানার স্টেন্ট-এর। এইটা পরখ করো। কিন্তু ওষুধপত্রেরও গবেষণাও তো থেমে নেই। সোজা কথায়, ওষুধ ও যথাযথ জীবনশৈলী মৃত্যুকে যতটা আটকাতে পারে, নানা ঢঙের অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি তার থেকে বেশি কিছু পারে না।

তবে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি কি একটি সর্বতোভাবে বাতিলযোগ্য চিকিৎসা প্রযুক্তি?

উত্তর হল, না। হার্ট অ্যাটাকের অব্যবহিত পরে চটজলদি প্রাইমারি অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে ফেলাটা সর্বোত্তম চিকিৎসা। সবরকমের ওষুধের দ্বারা বুকের ব্যথার উপশম করা না গেলে ক্রনিক (ইস্কিমিক) হৃদ্‌রোগে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি সাময়িকভাবে বুকের ব্যথার উপশম করতে পারে সেটাও ফেলনা নয়। এর বাইরে হৃদ্‌রোগের যে সুবিশাল অংশ পড়ে থাকে তাদের অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করে বিশেষ কিছু পাবার থাকে না, কিছু ওষুধপত্র ব্যবহার করলেই চলে। রোগটি যে নির্মূল হচ্ছে না সেটা বলাই বাহুল্য। অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি অথবা গুটিকয় অতিরিক্ত ওষুধে—এ দুটোর দ্বারা যদি সমমানের কর্মক্ষম জীবন উপহার দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে চিকিৎসকের কর্তব্য হল দুটো বিকল্পকে রোগীকে বুঝিয়ে বলা।

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হবার পরে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা হল

১. ক্রমবর্ধমান হৃদ্‌রোগের অগ্রগতিকে যতটা সম্ভব শ্লথ করা ও ২. ব্লক সৃষ্টিকারী রক্তনালীর মধ্যেকার (অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক) প্লাককে স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয় করে রাখা। এতে করেই হঠাৎ করে মারাত্মক আপৎকালীন দ্বিতীয় হার্ট অ্যাটাক আটকানো যাবে, দীর্ঘ ও কর্মক্ষম জীবন সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত করা যাবে। সুদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নত প্রযুক্তির অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি বা স্টেন্ট বা আরও অভিনব অন্যকিছু বেরোবে। তার উপযোগিতা নিয়ে আজকেই বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে এটা অনুমান করতে পারি, সেই পরিষেবা কেনার মতো মানুষ হবে নগণ্য। সেই রকম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ও পরিবেশনে আমার একটু অস্বস্তি হয়। হাতের কাছে আছে, অথচ পরিষেবা কেনার সামর্থ্য নেই—এই উপলব্ধিটা কষ্টের।

সরকার বাহাদুর অথবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সম্পদ, সেটা যতই বেশি হোক না কেন, উন্নত দেশও চড়ামূল্যের চিকিৎসা পরিষেবার সার্বজনীন প্রয়োগে অসফল। বিকল্প ভাবনা ভাবতেই হয়। বিজ্ঞানের গবেষণার অভিমুখ নির্ণয়ের ভার বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সচেতন নাগরিকদের ঠিক করতে হবে কীভাবে হৃদ্‌রোগে নিবারণ করা যাবে। সেটা যে প্রয়োজন আর সম্ভব এই কথাটা নতুন নয়। উন্নত দেশগুলো তার আস্বাদ পেয়েছে। আমেরিকার নব প্রজন্ম মিষ্টি পানীয় কম খাচ্ছে, এই প্রথম তাদের মধ্যে স্থূলতার হার কমেছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। অথচ ২০১১ সালের মেদিনীপুরের কয়েকটি স্কুলের এক সমীক্ষা অনুযায়ী আট এবং আঠারো বৎসর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেদভারে জর্জরিত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১৮.৫ ও ৫.৩ শতাংশ। অর্থাৎ ছোটোদের মধ্যে মোটা যাবার ঘটনা বেশি। এই পরিসংখ্যান দুটো একটা ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। আমাদের উত্তরসূরিরা ক্রমশ শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

জনগোষ্ঠীর হৃদ্‌রোগের মৃত্যু নিবারণে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি আর বাইপাস অপারেশনের ভূমিকা নগণ্য

বিগত তিন দশকে হৃদ্‌রোগে মৃত্যু ৪০ শতাংশ কমানো সম্ভব হয়েছে। এর অর্ধেক সম্ভব হয়েছে হৃদ্‌রোগ নিবারণ করে আর বাকি অর্ধেক সম্ভব হয়েছে ওষুধের চিকিৎসা এবং অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি আর বাইপাস অপারেশনের প্রবর্তনে। হৃদ্‌রোগের মৃত্যু নিবারণে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি আর বাইপাস অপারেশনের ভূমিকা নগণ্য, অথচ সরকারি স্বাস্থ্য বাজেটের একটা বড়ো অংশ আধুনিক উন্নত (?) মানের সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ থাকে। মিডিয়ার আলো, ডাক্তারির গ্ল্যামার, আমার আপনার দৃষ্টি সবই অধিকার করে রাখে অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম, অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি আর বাইপাস অপারেশন।

যাদের হৃদ্‌ধমনিতে ব্লক আছে তাঁদের কী হবে উপায়? ব্লকটাকে কি আনব্লক করা যাবে না? বন্ধ নালী কি উন্মুক্ত করা যাবে না?

হৃদ্‌রোগে স্বাভাবিক মাপে ও মানে বাঁচা যাবে কীভাবে? অন্তবর্তী প্রাপ্তি (surrogate achievement) আর অন্তিম (ultimate achievement) প্রাপ্তির মধ্যে যে তফাত সেইটে আমরা ধরতে পারছি না। টেকনোলজির চোখ ধাঁধানো আলো আমাদের বুদ্ধি গুলিয়ে দিচ্ছে। মায়োপিক দৃষ্টি থাকার জন্য আমরা ব্লকের অস্তিত্বের বাইরের প্রয়োজনবোধটা আমরা সহজেই ভুলে যাই। হৃদ্‌ধমনির ব্লক নির্মূল করা আমাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। আসলে আমরা স্বাভাবিক মাপে ও মানে সুস্থ দেহে (ও মনে) কর্মক্ষমভাবে টিকে থাকতে চাই, যেটা ব্লক নির্মূল করা আর না করার উপরে নির্ভরশীল নয়।

সেটা নির্ভর করে সহজে বোঝা যায় এমন দু-টি বৈশিষ্ট্যের উপরে। প্রথমটা ব্লকের স্থিতিশীলতা আর দ্বিতীয়টা আরও নতুন নতুন ব্লক সৃষ্টির অর্থাৎ রোগের অগ্রগতিকে থামানোর সফলতার উপরে নির্ভর করে। ব্লক সৃষ্টির মালমশলা স্থিতিশীল না থাকার জন্য তার ওপরে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালীকে পুরোপুরি বন্ধ করে যাওয়ার জন্য হার্ট অ্যাটাক হয়, এটা ব্লকের মাত্রার উপরে নির্ভরশীল নয়। রক্তনালীর ব্লকের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে তার ভৌত অবস্থার উপরে। নরম, অসম ঘনত্বের (heterogenous), প্রদাহ যুক্ত (inflammatory) পদার্থের ব্লক, যার উপরের আবরণটা পাতলা—সেটি স্থিতিশীল নয়। তেমন ব্লক অল্প মাত্রার (যেমন ২০-৩০%) হলেও সেটা হার্ট অ্যাটাক ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ হার্ট

অ্যাটাক আটকানোর একমাত্র উপায় হল, ব্লক সৃষ্টিকারী প্লাকটিকে স্থিতিশীল করে দেওয়া। অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি সেটির উলটোটাই করে।

অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির প্রকৃত আবেদন অন্যত্র। ওষুধে হৃদ্‌রোগীর কষ্ট লাঘব না করা গেলে বা রোগীকে কর্মক্ষম না করা গেলে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি একাধিক আপোশের বিনিময়ে বেঁচে থাকার মানোন্নয়ন করতে পারে। সেটা অন্য আলোচনা। টুকরো টুকরো এখান ওখান থেকে পাওয়া খবরে দিশেহারা রোগী, কোনটা তার সত্যিকারের ভালো সেটা না বোঝারই কথা। সুচিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্ব তার ভালো হবার পন্থাগুলো বাতলে দিয়ে, তার সুবিধা-অসুবিধা খরচ, ইত্যাদির খবর দিয়ে তাঁকে চিকিৎসা-পন্থা বেছে নিতে সাহায্য করা। সত্তর বছরের এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেবল বিনা ব্যথায় দৌড়ঝাঁপ করতে পারার লাক্সারির জন্য আড়াই লাখের স্টেন্ট না লাগিয়ে যদি কম পরিশ্রমের জীবন বেছে নেন তবে আমি তাঁকে বুদ্ধিমান বলব। কারণ ওষুধের খরচ দুই ক্ষেত্রেই একই থাকছে। এই ওষুধের কথাই আমার শেষ বক্তব্য।

হৃদ্‌রোগীদের যে সব ওষুধ খেতে হয় তার তিনটে উদ্দেশ্য থাকে— ১. রোগের কষ্ট কমানো ২. হার্ট অ্যাটাক আটকানো ও ৩. যথাসম্ভব রোগের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে শ্লথ করা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ওষুধগুলো বিগত তিন দশক ধরে এমন এক ঔৎকর্ষ লাভ করেছে যে, কেবল ওষুধের চিকিৎসা আর সুস্থ জীবনশৈলীর চিকিৎসার উপরে ভরসা রাখা যায়। এই ওষুধগুলি ব্লক সৃষ্টিকারী প্লাককে স্থিতিশীল করে, রোগের অগ্রগতিকে সবচেয়ে শ্লথ করে।

সারমর্ম

অনেক কথা বলা হয়ে গেল। এবার একটু সারমর্ম চাই।

১. হার্ট অ্যাটাক বা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়া এক বিভীষিকা। এর জন্যে আমরা সম্পদ সঞ্চয় করি, মোটা অঙ্কের মেডিক্লেইম পলিসি করি, রাতের ঘুম নষ্ট করি।

২. অতর্কিতে অসময়ে বুকের ব্যথার কারণ হলে সেটা হার্টের রোগের কারণে হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। এই তথ্যটা না জানার কারণে, জেনেও বিশ্বাস না করার কারণে আর কুসময়ে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করার ক্ষমতা না থাকার কারণে বুকের ব্যথার ব্যক্তিদের প্রায়শই মুনাফালোভী কর্পোরেট চিকিৎসা ব্যবস্থার শিকার হয়ে যেতে হয়।

৩. বুকের ব্যথায় কাতর ও উদ্বিগ্ন পরিবারের উদ্বেগের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বেসরকারি ও সরকারি (সরকারিও বটে) চিকিৎসা সংস্থা আপনার পকেট কাটলে আপনি তৎক্ষণাৎ না বুঝতেই পারেন। সেই দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াটা কেবল কঠিনই নয়, অসম্ভবও।

৪. ব্যাবসায়িক কারণ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবনমন চিকিৎসকদেরও প্রভাবিত করে। এটা বুকের ব্যথার সঠিক কারণ নির্ণয়ের পথে এক মস্ত বাধা। এর প্রতিকারের জন্য চাই ত্রিমুখী প্রচেষ্টা। প্রথমত, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ত সুস্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক চিকিৎসা নীতি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ, ও তৃতীয়ত বাণিজ্যিক সংস্থার নাগপাশ থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থার মুক্তি।

৫. বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি ও চিকিৎসা প্রযুক্তির সরঞ্জাম প্রস্তুতকর্তার ঝুলি থেকে ক্রমাগত তথাকথিত উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি বাজারে প্রবেশ করবে। এই প্রযুক্তির গবেষণার অভিমুখ কী হবে সেটা ঠিক করে দেওয়ার অধিকার জনসাধারণের ওপরেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। এমন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিকের নিয়োগ করা দরকার যেটার ফসল সার্বজনীন প্রয়োগের উপযুক্ত।

৬. যেকোনো বুকের ব্যথার ব্যক্তির অথবা আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ, অর্থাৎ বুকে ব্যথা নেই বা শ্বাসকষ্ট নেই এমন ব্যক্তির করোনারি আর্টারিতে ব্লক থাকতেই পারে—যেটা আর হৃদ্‌রোগ সমার্থক নয়। এই ধরনের ব্যক্তির অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করলে তিনি বেশিদিন বাঁচেন অথবা বেশি পরিশ্রম করতে পারেন এমন প্রমাণ নেই।

৭. হার্ট অ্যাটাক হবার অব্যবহিত পরেও (দুই ঘণ্টার মধ্যে) যে সব হৃদ্‌রোগীর ওষুধে বুকের কষ্ট কমছে না আর সেই বুকের কষ্ট হৃদ্‌ধমনির ব্লকের কারণে হচ্ছে এটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে একমাত্র তাঁদেরই স্টেন্টসহ অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি কাজের বলে প্রমাণিত।

৮. হার্ট অ্যাটাক হবার পরে যদি সেই কুসময়ে তৎক্ষণাৎ অ্যাঞ্জিয়োগ্রাম ও অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি না করা যায়, তবে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ওষুধের দ্বারা ব্লকের উপরের জমাট বাঁধা রক্ত দ্রবীভূত করার ওষুধ প্রয়োগ করা একটি কাজের চিকিৎসা। দু-ঘণ্টার মধ্যে করা অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টির চাইতে এ চিকিৎসা কম সুফলদায়ক, কিন্তু দেরি করে (দু-ঘণ্টার বেশি) অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি করার চেয়ে শতগুণে শ্রেয়।

৯. অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি, স্টেন্ট, বাইপাস অপারেশন, ইত্যাদি যাই করা হোক না কেন, সব ক্ষেত্রে আজীবন পুর্ণ মাত্রায় ওষুধের প্রয়োগ করতে হবে।

১০. হার্ট অ্যাটাক হবার পরে, হার্টের রোগের শুরুর দিকে অথবা সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী হৃদ্‌রোগের ক্ষতি থেকে অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে। ওষুধ, অ্যাঞ্জিয়োপ্লাস্টি, স্টেন্ট অথবা বাইপাস অপারেশন এর কোনোটা দিয়েই সুরক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়।

১১. পৃথিবীর সম্পদ অফুরান নয়, গুটিকয় জটিল হৃদ্‌রোগীদের চিকিৎসায় সেই সম্পদের অসম ব্যয় করে কেবল হাততালি কুড়ানো যায়, মিডিয়ার আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া যায়।

সুবিশাল জনগোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদি সুফলের জন্য চাই বুদ্ধিদীপ্ত ও সুপরিকল্পিত প্রয়াস। ট্রেনে সফরকালে, বা রাস্তাঘাটে কাজের ফাঁকে আপনার চা তেষ্টা পেলে আপনাকে এদেশে বাধ্য হয়েই চিনি মেশানো চা খেতে হবে। এমনটা উন্নত দেশে হয় না। উন্নত দেশ থেকে কেবল রোগ নিরাময়ের ওষুধ আমদানি করলেই হবে না। বিজ্ঞান প্রয়োগের কলাকৌশলও শিখতে হবে। শিশুকাল থেকে স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী গঠনের স্বভাব তৈরির প্রয়াস চাই। চাই পার্কের বদলে খোলা মাঠের নির্মাণ, যেখানে শারীরিক পরিশ্রম করার পথে রেলিং-এর বাধা থাকবে না। চাই মিষ্টি পানীয় ও মিষ্টির দোকান, চটজলদি খাবার বা ফাস্ট ফুডের ও তামাকের দোকানের অবলুপ্তি বা কঠোর নিয়ন্ত্রণ। প্রাইমারি স্কুলের সিলেবাসে থেকে স্বাস্থ্য জীবনশৈলীর পাঠের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। অভ্যাস বদলের বিপ্লব, তার চর্চা আর সামাজিক স্বীকৃতি, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা না হলে সুস্বাস্থ্যের বদলে রোগ মেরামতের লড়াইটাই আমাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পদ ও উদ্যোগের সিংহভাগ আদায় করে নিয়ে যেতে থাকবে। স্বাস্থ্যের বৃত্ত

ডা. গৌতম মিস্ত্রী, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, কার্ডিয়োলজিস্ট। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা ক্ষয়জনিত হাঁটুর ব্যথা

মানুষের আয়ু যত বাড়ছে ক্ষয়জনিত ২রোগ তত বাড়ছে। হাঁটুর অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ভুগছেন এখন বহু মানুষ, তাই এ নিয়ে ব্যাবসাও বাড়ছে। কিন্তু এর চিকিৎসা নিয়ে বিজ্ঞান কী বলে? জানাচ্ছেন **ডা. মৃন্ময়**।

হাঁটুর ব্যথার কথা বললেই আমার ভগবান কাকুর কথা মনে পড়ে। সবাই ডাকত 'ভানু'। ভানুকাকু স্থানীয় ক্লাবের আয়োজিত দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর প্রথম হত। প্রায় বছর ১০ আগে সকালে দুধ দুইতে গিয়ে হাঁটুতে গোরুর লাথি খেয়ে ভানুকাকুর দৌড় জীবনের সমাপ্তি ঘটে। প্রায় সপ্তাহ খানেক 'বিছানা শয্যা'। এদিকে ধান পেকে গেছে। চাষবাসই ভানুকাকুর মূল জীবিকা। অগত্যা খোঁড়াতে খোড়াতে নিরুপায় ভানুকাকু চলল ধান কাটতে। সেই যে হাঁটুর ব্যথা শুরু তার সমাপ্তি এখনও ঘটেনি। প্রথমে স্থানীয় কোয়াক ডাক্তারের কাছে ব্যথার ওষুধ খেয়ে টেনেটুনে কিছুদিন চলে। কোয়াক ডাক্তার অবশ্য ব্যথা না সারা অবধি বিশ্রাম নিতে বলেছিল। কিন্তু বিশ্রাম নিলে সংসার চলবে কী করে, চার চারটে পেটকে তো চালিয়ে রাখতে হবে। তার ওপর ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ। সুতরাং বিশ্রাম বাতিল এবং ব্যথাকে সঙ্গী করে জীবন চলা শুরু ভানুকাকুর।

তারপর প্রায় বছর দুই অন্য এক ডাক্তারের কাছে দু-মাস অন্তর ৫০ টাকা ভাসিয়ে হাঁটু থেকে জল বার করতে হয়েছিল। অবাক হয়ে যেতাম—কাকুর হাঁটু তো ফোলা ছিল না। তবুও হাঁটুর ভেতর থেকে কীভাবে যে জল বেরোত সে গল্প শুনলে যেন পি সি সরকারের জাদু মনে হত। অতঃপর তাতেও ব্যথা না কমলে অবশেষে শিবের মানত, মাদুলি, বিখ্যাত এক কবিরাজের দেওয়া অর্জুন গাছের ছাল কিছুই বাদ যায়নি। কিন্তু কিছুতেই সারে না, শেষমেশ পাড়ার হরি ডাক্তারের কাছে হাজির। হরি ডাক্তারের অধ্যায় প্রায় ৬ মাস চলেছিল। হরি ডাক্তার একখানা মোজা পরিয়ে দিয়েছিল হাঁটুতে। আমরা তো আরও অবাক, হাঁটুতে আবার মোজাও পরে। জোকার জোকার মনে হত কাকুকে তখন। আর হরি ডাক্তার মাঝে মাঝে কী কী সব ওষুধ খাওয়াত। কিছুদিন দেখতাম ভানুকাকু বেশ খাটাখাটি করছে। আবার পকেটে টান পড়লে ওষুধ বন্ধ আর ভানুকাকুর খোঁড়ানো শুরু। তারপর মাঝে মাস তিন এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের দু-বেলা দু-ফোঁটার চক্করে পড়েছিল। আমাদের পোলিও খাওয়া শেষ হলেও ভানুকাকুকে বুড়ো বয়সে পোলিও- এর মতো দু-ফোঁটা খেতে দেখে বেশ হাসিই পেত।

আসলে একটা কথা বলাই হয়নি ভানুকাকু নাকি সুরে কথা বলে। তাই আমরা পাড়ার ছেলেরা বেশ পিছনে লাগতাম ভানুকাকুর, যেনতেন প্রকারে। তাই আমাদের খেলার শেষের আড্ডায় ভানুকাকুর আলোচনা আসতই।

ছোটোবেলায় একটা সিনেমা দেখেছিলাম 'ভানু পেল লটারী'। শ্যামল মিত্রের ওই গানটা ''পুতুল নেবে গো পুতুল . . .'' আমার খুব প্রিয়। ফেরিওয়ালা বলতে ছোটোবেলায় ছবি ভেসে উঠত ধুতি বা লুঙ্গি পরা কোনো লোক যার ঝুড়ি থাকে ও ঝুড়িতে নানা পুতুল থাকে। যে ঝুড়ি একসঙ্গে রাম-রাবণ-হনুমান-বিবেকানন্দ-চিত্তরঞ্জন-নিমাই-সুভাষ-রবিঠাকুরকে ধারণ করে নিত। ভানুকাকু ছেলেকে কলকাতায় কলেজে ভর্তি করতে এসে কলকাতার লোকাল ট্রেনের প্যান্ট শার্ট পরা ব্যাগ হাতে হকারদের দেখে। সে গল্প আমাদের শুনিয়েছিল। আমরা তো সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে ফেরিওয়ালা পুতুল-খেলনা না বেচে গ্যাস-হজম- পায়খানা পরিষ্কারের দানা বিক্রি করে, আর বাতের টাইগার বাম বিক্রি করে! টাইগার মলম লাগাতে লাগাতে ভানুকাকু বলেছিল এই বামে নাকি দু-সপ্তাহে হাঁটু ব্যথার কেল্লা ফতে হবে। তা হয়নি, তবে আমরা ওই মলমের কিছুটা নিয়ে সেবার নাটকে সমবেত কান্নার রোলটা উতরে দিয়েছিলাম। ভানুকাকুর লাভ নাই হোক আমাদের নাটকটা বেশ ইমোশনাল হয়েছিল।

আমার কলকাতায় আসার পর আর ভানুকাকুর সঙ্গে তেমন করে দেখা হয়নি। শেষ ৬ মাস আগে শেষবার যখন পাড়ার চায়ের দোকানে ভানুকাকুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন কিছু গল্প হয়েছিল। ভানুকাকুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে ঢাকুরিয়াতে, জামাই ইঞ্জিনিয়ার। মেয়ের দৌলতে ভানুকাকুর আপাত ঠাঁই বাইপাসের এক বড়ো নার্সিংহোমে। হাঁটু বদলানো হবে, খরচ প্রায় ২ লাখ টাকা। পাঁচ বিঘা জমি বন্ধক দিয়ে ১.৫ লাখ টাকা এসেছে। বাকি ৫০ হাজার জোগারের জন্য প্রতিদিন সন্ধেবেলা ৪ ঘণ্টা করে একটি গেঞ্জি কারখানায় আংশিক কর্মচারী হিসাবে যোগ দিয়েছে।

আমি সহজ সরল উপায় দিলাম, প্রতিদিন আধঘণ্টা ব্যায়াম করার। কিন্তু সপাট উত্তর: 'দুর ওই ব্যায়াম-ট্যায়াম করার সময় আছে নাকি আমাদের মতো ব্যস্ত মানুষের।' আমি মনে মনে ভাবলাম ৪ ঘণ্টা গেঞ্জি কারখানায় কাজ করা যায়, কিন্তু আধঘণ্টা ব্যায়াম করা যায় না। যাক গে আমার বাণী ডাস্টবিনে ফেলে সব বুড়োর দল পতঞ্জলি ও জিলাঙ্গোর গল্পে মাতলেন।

আমার চোখ তো ছানাবড়া—আহা রামদেব ও সৌমিত্রের কী মহিমা! ভেবে অবাক লাগে 'হীরক রাজার দেশের' মাস্টারমশাই হনুমান চালিশা আর জিলাঙ্গোতে আজ মত্ত।

কে জানে ভানুকাকুর ঠাঁই শেষমেষ কোথায় হবে।

তা ভানুকাকু অশিক্ষিত বা গেঁয়ো যাই হোক না কেন ভানুকাকুর জীবনের সঙ্গে আপনার নিজের বা কাছের লোকেদের জীবনের মিল অনেকই হয়তো খুঁজে পাচ্ছেন। আর কমবয়স্ক যারা বুড়ো-বুড়িদের গল্প ভেবে হেসে ওড়াবেন ভাবছেন, তাদের বলি সাবধান হোন কথায় আছে 'ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে'।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস কী?

অস্টিওআর্থ্রাইটিস হল ক্ষয়জনিত গাঁটের ব্যথা। সাধারণত বেশি বয়সে দেখা যায়। এর ফলে কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় এবং জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটে। এর প্রভাব পড়ে রোগীর দৈনন্দিন জীবনে, কাজের ক্ষেত্রে, পরিবারে, বিনোদনে ও মানসিক জীবনে। আর্থ্রাইটিসের ব্যথা হল বিশ্বব্যাপী কর্মহীনতার অন্যতম প্রধান কারণ।

কী হয় হাঁটুর অস্টিওআর্থ্রাইটিসে?

হাঁটু হল আমাদের শরীরের নিম্নভাগের একটি প্রধান গাঁট বা অস্থিসন্ধি। এটি আমাদের শরীরের সবচেয়ে বেশি চাপ সহ্য করা গাঁটগুলির মধ্যে অন্যতম। এর সামনে চাকতির মতো হাড় থাকে যাকে আমরা মালাইচাকি বলি। এই মালাইচাকির পিছনের দিকে উপরের ও নীচের হাড়ের প্রান্তভাগে নরম তরুণাস্থি থাকে। এই তরুণাস্থি অনেকটা গদির মতো কাজ করে। আর দুই তরুণাস্থির মাঝে একটি থলির মতো থাকে, যার মধ্যে অল্প পরিমাণে তরল বস্তু থাকে যা অনেকটা গ্রিজের মতো কাজ করে। একে সাইনোভিয়াল রস (Synovial Fluid) বলে। এই গঠনগত বিশেষত্বের ফলে দু-টি হাড়ের মধ্যে ঘর্ষণ কম হয় ও সন্ধিস্থলে হাড় দু-টি সহজে নাড়াচাড়া করতে পারি আমরা।

সমস্যা হয় যখন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই গদির মতো তরুণাস্থির ক্ষয় ঘটতে থাকে এবং ওই তরুণাস্থির জায়গায় হাড়ের খোঁচা তৈরি হয়। যার ফলে হাড় দু-টির সন্ধিস্থলে ব্যথা হয়, জড়তার সৃষ্টি হয় এবং গতিবিধি স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়।

কী কারণে হয় এই ক্ষয়জনিত হাঁটুর বাত?

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের সমস্ত গাঁটগুলি কিছু না কিছু মাত্রায় আঘাত ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শরীর এগুলিকে ঠিক করে নেয়। এক্ষেত্রে অস্থিসন্ধির গঠনগত কিছু পরিবর্তন ঘটে বটে কিন্তু আমরা তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হই না।

সমস্যা ঘটে যখন অস্থিসন্ধি বেশি মাত্রায় ক্ষতি বা আঘাতের সম্মুখীন হয় অথবা যখন শরীর ক্ষতি পুরোপুরি ঠিক করতে পারে না। তখন এই ধরনের বাতের সমস্যা আমরা বুঝতে পারি। এই অবস্থাকে উপসর্গ যুক্ত অস্টিওআর্থ্রাইটিস বলা হয়।

যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক কারণ জানা যায় না, তবুও যে যে কারণগুলি এই ধরনের বাতের সৃষ্টি করে তা হল—

১. স্থূলতা: শরীরের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে হাঁটুর ওপর চাপ বেশি পড়ে। হাঁটুর আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে ও সঙ্গে অস্টিওআর্থ্রাইটিস-এর সম্ভাবনাও বাড়ে।

২. বয়স: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণাস্থির ক্ষয় হয় ও এই বাত বাড়ে।

৩. আঘাত: পূর্বে বা বর্তমানে হাঁটুতে কোনো আঘাত পেলেও এর সম্ভাবনা বাড়ে। তাছাড়া আঘাতের পরে হাঁটু যদি উপযুক্ত বিশ্রাম না পায় তাহলেও এর সম্ভাবনা বাড়ে।

৪. অন্যান্য রোগের জন্য: রিউমাটয়েড বাত বা ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার কারণে বাতের জন্য পূর্বে হাঁটুর ক্ষতি হয়ে থাকলে পরবর্তীতে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের প্রবণতা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

রোগের উপসর্গ

এই ধরনের বাতের উপসর্গের মাত্রা ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন হয়। কারোর কারোর ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি খুব কম মাত্রায় ও মাঝে মাঝে দেখা যায়। অনেকের ক্ষেত্রে আবার বেশি মাত্রায় ও প্রায় সর্বদা এর প্রকাশ ঘটে।

উপসর্গগুলি হল—

- হাঁটুর ব্যথা বা যন্ত্রণা বা উভয়ই।
- হাঁটুর জড়তা।
- হাঁটুতে সামান্য ফোলা ভাব।
- সিঁড়ি ভাঙতে বা হাঁটু মুড়ে বসতে গেলে ব্যথা।
- অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর বসতে গেলে বা অনেকক্ষণ বসার পর দাঁড়াতে গেলে ব্যথা।
- গাঁটের হাড় দুটো নাড়ানোর সময় গাঁটের মধ্যে ঘষার শব্দ বা কট্‌কট্ শব্দ।

রোগ নির্ণয়

রোগের উপযুক্ত ইতিহাস, রোগের উপসর্গ ও রোগীর শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সম্ভব, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এক্স-রে, এম.আর.আই., রক্ত পরীক্ষা, হাঁটু থেকে জল বের করে পরীক্ষা করার দরকার পড়ে না।

কখন এই রোগ সন্দেহ করবেন?

- যদি রোগীর বয়স ৪৫ বা তার বেশি হয়।
- হাঁটুর ব্যথা ও যন্ত্রণা যা কাজ করলে বাড়ে।
- ঘুম ভাঙার পর হাঁটুর জড়তা অনুপস্থিত থাকবে বা থাকলেও তা ৩০ মিনিটের কম সময় স্থায়ী হবে।

কখন অন্য কোনো রোগ সন্দেহ করবেন?

- হাঁটুর ব্যথা আঘাতের জন্য হলে।
- হাঁটুর জড়তা ভোরবেলা ৩০ মিনিটের বেশি স্থায়ী হলে।
- উপসর্গগুলি খুব দ্রুত বাড়তে থাকলে।
- কম বয়সে হাঁটুর ব্যথা দেখা দিলে।
- হাঁটু ফুলে থাকলে, লাল হয়ে থাকলে বা গরম হয়ে থাকলে।
- ব্যথা হঠাৎ করে শুরু হলে।

❖ একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ব্যথা অনুভূত হলে।
❖ এক সঙ্গে অন্যান্য গাঁটেও ব্যথা হলে।
❖ ব্যথা অন্যান্য গাঁটে সরে সরে গেলে।

উপরোক্ত ধরনের সঙ্গে হাঁটুর ব্যথার মিল থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এক্ষেত্রে রিউমাটয়েড বাত, ইউরিক অ্যাসিডের দরুন বাত, রিউম্যাটিক জ্বরের জন্য বাত, হাড় ভেঙে যাওয়ার জন্য বাত, হাঁটুর মধ্যে সংক্রমণ বা টিউমার হতে পারে।

পরীক্ষানিরীক্ষা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষার দরকার পড়ে না, যদি পূর্ব উল্লিখিত উপসর্গগুলি না থাকে সেক্ষেত্রে রক্ত, এক্স-রে বা এম.আর.আই করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এক্স-রে বা এম.আর.আই করে রোগের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসা কী মাত্রায় করা দরকার তা মূলত নির্ভর করে উপসর্গের মাত্রার ওপর।

চিকিৎসা

হাঁটুর অস্টিওআর্থ্রাইটিস একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। এই রোগে হাঁটুর যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা ঠিক করা যায় না। কিন্তু উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে রোগের উপসর্গগুলি অনেক কমিয়ে ফেলা যায় ও প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়।

অন্যান্য রোগের মতো এক্ষেত্রেও সর্বপ্রথম রোগীকে রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কিত নানা পদ্ধতির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করা চিকিৎসকের সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত। রোগ সম্পর্কিত প্রচলিত ভুল ধারণাগুলিকে যুক্তি সহকারে বোঝানো উচিত।

❖ রোগ ও তার উপসর্গ আক্রান্ত ব্যক্তির কার্যক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, পারিবারিক জীবনে, মনের ওপর ও বিনোদনে কী প্রভাব ফেলছে তার ধারণা প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকের মধ্যে তৈরি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

❖ উপরোক্ত দুই আদান-প্রদানকে বাদ দিয়ে কার্যকরী ও উপযুক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ণয় করা সম্ভব নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুই পর্যায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপেক্ষিত, তা সরকারি বা বেসরকারি যে ক্ষেত্রই বলুন না কেন।

বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল—

১. ব্যায়াম: ব্যথা থাকুক বা না থাকুক, থাকলেও যে মাত্রায় থাকুক না কেন ব্যায়ামই হল প্রধান হাতিয়ার, রোগী যে বয়সের হোন না কেন বা রোগ যে পর্যায়ে থাকুক না কেন ব্যায়াম করা দরকার। এই ব্যায়াম করার কারণ হল—

❖ হাঁটুর পার্শ্ববর্তী মাংসপেশিগুলিকে মজবুত করা।
❖ সাধারণ ফিটনেস বাড়ানো।

সাধারণ ফিটনেস বাড়ানোর জন্য অ্যারোবিক ব্যায়াম খুব কার্যকরী। যেমন—দৌড়ানো, জোরে হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, লাফদড়ি, (স্কিপিং) করা, ফুটবল খেলা, ব্যাডমিন্টন খেলা ইত্যাদি।

আর হাঁটুর মাংসপেশিকে মজবুত করার জন্য কী ব্যায়াম করবেন তা চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্ট-এর তত্ত্বাবধানে শিখুন। কারণ এই ব্যায়াম রোগের মাত্রা, পরিবেশ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক রোগ (হৃদ্‌রোগ)-এর ওপর নির্ভর করে বদলাতে পারে।

২. ওজন কমানো: যাদের ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি তাদের ক্ষেত্রে ওজন কমানো অন্যতম পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে অ্যারোবিক ব্যায়াম ও খাবারের পরিমাণ ও গুণগত মানের পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনে ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিন। মোটামুটি একটি সহজ হিসেবে উচ্চতা (সেন্টিমিটারে) থেকে ১০০ বাদ দিলে যা হয়, ওজন তার থেকে কম হওয়া উচিত (কিলোগ্রামে)।

অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি হল—

সাধারণ সেঁক দেওয়া: হাঁটুতে হালকা গরম সেঁক দিলে আরাম পাওয়া যায় সাময়িকভাবে, কাপড় ভাঁজ করে হাঁটুতে সেঁক দিতে পারেন। নতুবা বিশেষ ব্যাগের (Hot water bag) মাধ্যমেও সেঁক দেওয়া যায়।

বিদ্যুৎ দ্বারা বিশেষভাবে হাঁটুতে সেঁক দেওয়া: TENS (Transcuteneous Electrical Nerve Stimulation)-এর মাধ্যমে হাঁটুর মধ্যে স্বল্প মাত্রায় কারেন্ট পাঠিয়ে ব্যথা কমানো খুব কার্যকরী, যদিও এর যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থা সর্বত্র পাওয়া যায় না। শব্দোত্তর তরঙ্গ চিকিৎসা বা ইউএসটি (UST, Ultrasonic Therapy) অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যদিও হাঁটুর ব্যথার ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা অনেকটাই কম।

ব্যথার ওষুধ:

❖ প্যারাসিটামল
❖ স্টেরয়েড নয় এমন প্রদাহ বিরোধী ওষুধ (NSAIDS)
❖ আইবুপ্রোফেন, অ্যাসিক্লোফেনাক, ডাইক্লোফেনাক, অ্যাসপিরিন, ইন্ডোমিথাসিন, স্যালিসাইলেট জাতীয় ওষুধ।
❖ সিলেকটিভ কক্স-২ ইনহিবিটর—ইটরিকক্সিব, সেলেকক্সিব, ইত্যাদি।
❖ ওপিঅয়েডস (Opiods) বা মরফিন জাতীয় কার্যকরী ব্যথার ওষুধ।
❖ কোন ব্যথার ওষুধ ব্যবহার করবেন তা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত নিন। কারণ এই ব্যথার ওষুধগুলির নানারকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। বিশেষত হার্ট, কিডনি, লিভার ও পাকস্থলির রোগের ক্ষেত্রে ও বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। যদি নিজে নিজেই ব্যথার ওষুধ খেতেই হয় তা হলে প্যারাসিটামল খেতে পারেন। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক কম।

হাঁটুর মধ্যে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন: ওষুধে ব্যথা না কমলে স্টেরয়েড ইঞ্জেকশন হাঁটুর মধ্যে দেওয়া যায়। কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে ও দক্ষ ব্যক্তি দ্বারা ইঞ্জেকশন দেওয়া উচিত, নতুবা হাঁটুর মধ্যে সংক্রমণ ও আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জুতো ও সাহায্যকারী ব্রেস (Brace): হাঁটুর অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জুতো (যার ধাক্কা সামলানোর বা Shock Absorbing গুণ বর্তমান) ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি গঠনগতভাবে বেঁকে যাওয়ার দরুন হাঁটুতে ব্যথা বেশি হয় বা হাঁটুর গাঁটের হাড়গুলো কিছুটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে (Stability হারায়) তাহলেই কেবল হাঁটুর সাপোর্টের জন্য ব্রেস ব্যবহার করা যেতে পারে।

অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা:

● অপারেশন দ্বারা হাঁটু বদলানোর কথা তখনই ভাবা উচিত যখন অন্যান্য পদ্ধতিতে পূর্ণ মাত্রায় চিকিৎসা করেও তেমন কোনো লাভ হচ্ছে না, বা

অস্টিওআর্থ্রাইটিসের মাত্রা এতটাই বেশি যে তা অন্যান্য পদ্ধতিতে নিরাময় সম্ভব নয়।

● আর্থ্রোস্কোপির মাধ্যমে বেড়ে যাওয়া হাড়ের খোঁচাগুলিকে ছোটো ছোটো করে কেটে বের করে দেওয়া, আগে চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর প্রচলন অনেক কম ও কার্যক্ষমতা প্রশ্নাতীত নয়। কেবলমাত্র যদি 'হাঁটু আটকে যাওয়া' (Mechanical locking)-এর উপযুক্ত ইতিহাস থাকে তবেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অবশ্যই মেকানিক্যাল লকিং-কে ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর জড়তার থেকে আলাদা করা আবশ্যক।

● সর্বোপরি অপারেশন দ্বারা চিকিৎসা করতে হলে অপারেশন-এর সুবিধে, অসুবিধে ও অপারেশন পরবর্তী পুনর্বাসন সম্পর্কে অবহিত হোন। উপযুক্ত পুর্নবাসন ছাড়া কেবলমাত্র অপারেশনে উপকারের চেয়ে অনেক সময় ভোগান্তিই বেশি হয়।

আকুপাংচার: পূর্বে ব্যথা কমানোর জন্য আকুপাংচারের ব্যবহার থাকলেও বর্তমানে আকুপাংচারের ব্যবহার নিষিদ্ধ [Osteoarthritis: Care and Management-NICE Clinical Guideline 2014-এ উল্লিখিত]

হাঁটু ব্যথা নিয়ে বাজার-ব্যাবসা

একটু চোখ-কান খোলা রাখলে বুঝতে পারবেন ব্যথাজনিত সমস্যা, বিশেষ করে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ব্যাবসার অন্ত নেই। পাড়ার অ-পাশ করা ডাক্তার থেকে বড়ো বড়ো বেসরকারি হাসপাতাল, ট্রেনের কবিরাজি তেল থেকে টাইগার বাম, ব্যথার মলম থেকে ইঞ্জেকশন দিয়ে হাঁটু থেকে জল বের করা, অর্জুন গাছের ছাল থেকে আয়ুর্বেদিক দৈব তেল, পতঞ্জলি থেকে বাবা-মৌলবির তাবিজ, জিলাক্সো থেকে ন্যাচারোভেদা—সকলেই মোটামুটি ব্যথার রোগীকে নিয়ে ফুটবল খেলতে ব্যস্ত। আর ডাক্তাররাও অনেকেই কুবেরের উপাসক—কাজ হবে না জেনেও স্টেরয়েড ও যথেচ্ছ ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ব্যবহার করেন। আর তেমন মগজধোলাই করতে পারলে তো সাত-তাড়াতাড়ি হাঁটু বদলে দিয়ে নিশ্চিন্তে হরির লুট।

❖ বাজারে সবচেয়ে প্রচলিত ব্যথা কমানোর ওষুধ হল ব্যথার মলম। মলম স্থানীয়ভাবে কাজ করে কিছুটা ব্যথা কমায়। কিন্তু মুখে খাওয়ার ব্যথার ওষুধ ব্যবহার করলে খরচ অনেক কম হয় ও অনেক ভালো ফল পাওয়া যায়।

❖ হাঁটুর মধ্যে হায়ালিউরোনান (Hyaluronan) ইঞ্জেকশন দেওয়া উচিত নয় (Osteoarthritis: Casre and Management- NICE clinical Guideline 2014)

❖ অস্টিওআথ্রাইটিসের ক্ষেত্রে গ্লুকোসামিন ও কন্ড্রয়টিস (Glucosamine and Chondroitin) জাতীয় যৌগের ওষুধ-এর ব্যবহারে তেমন লাভ হয় না। (Osteoarthritis: Care and Management-NICE Clinical Guideline 2014) যদিও বাজারে এই জাতীয় ওষুধের রমরমা। সরকারি হাসপাতালেও ব্যাপক হারে এর ব্যবহার হয়। প্রশিক্ষণ পর্বের সময় এর অভিজ্ঞতা আমার অনেক হয়েছে।

❖ অনেক পাশ ও অ-পাশ করা ডাক্তার চিকিৎসার নামে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে হাঁটু থেকে জল বের করেন। যদি না হঠাৎ করে হাঁটু ফুলে যায়, লাল হয়ে যায়, গরম হয়ে যায় তাহলে হাঁটু থেকে জল বের করা যুক্তিহীন। এতে লাভ তো হয়ই না বরং উলটে ক্ষতি বেশি হয়।

❖ আপনি ডাক্তারের কাছে হাঁটু ব্যথা নিয়ে গেলেন আর আপনাকে নী ক্যাপ (Knee Cap) বা ব্রেস (Brace) দিয়ে দিল ডাক্তার। প্রয়োজন ছাড়াই ব্রেস বা নী ক্যাপ ব্যবহার করলে হাঁটুর চারপাশের মাংসপেশি স্বাভাবিকের চেয়ে কম কাজ করে ও হাঁটুর গতিবিধি স্বাভাবিকের চেয়ে কমে। ফলে সাময়িক ব্যথা কমতে পারে, কিন্তু শেষমেষ হাঁটুর চারপাশের মাংশপেশি দুর্বল হতে থাকে ও হিতে বিপরীত হয়।

আজকাল ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর মিশ্রণ ওষুধ যথেচ্ছ হারে ব্যবহার করেন চিকিৎসকরা। অন্যান্য কিছু ভিটামিন বেশি খেলে তা প্রস্রাব দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু এই ভিটামিন ডি আমাদের শরীরে চর্বির মধ্যে সঞ্চিত হয়। ফলে এই মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন ডি-এর সঞ্চয়ের ফলে ভিটামিন ডি-এর থেকে অনেক শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রয়োজন ছাড়াই ব্রেস বা নী ক্যাপ ব্যবহার করলে হাঁটুর গতিবিধি স্বাভাবিকের চেয়ে কমে। ফলে সাময়িক ব্যথা কমতে পারে, কিন্তু শেষমেষ হাঁটুর চারপাশের মাংশপেশি দুর্বল হতে থাকে ও হিতে বিপরীত হয়।

আর দেখা গেছে ক্যালশিয়াম ব্যবহার করলে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে কোনো লাভ হয় না, এম. আর. আই করেও কোনো উন্নতির প্রমাণ মেলেনি।

কীভাবে হাঁটুর অস্টিওআর্থ্রাইটিস আটকাবেন?

১. নিয়মিত অ্যারোবিক ব্যায়াম করুন (সপ্তাহে ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট)

২. ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে কমান।

৩. আঘাত লাগলে যথাযথ বিশ্রাম নিন।

৪. যারা নিয়মিত খেলাধুলো করেন তারা খেলার শুরুর আগে যথাযথ ওয়ার্মআপ ব্যায়াম করুন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকের চিকিৎসক।

১৯৭৯-র ডিসেম্বরে দল্লিরাজহরার ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রাণ হারান লোহা-খনির ঠিকাদারি শ্রমিক কুসুমবাই। প্রসূতি কুসুমবাই ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘের উপাধ্যক্ষা ছিলেন। কুসুমবাইয়ের মৃত্যুতে শ্রমিকরা শপথ নেন নিজেদের এক মাতৃসদন গড়ে তোলার। শেষে মাতৃসদন নয়, গড়ে ওঠে শহীদ হাসপাতাল। আর এক বিশাল জনস্বাস্থ্য আন্দোলন।

কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

ঠিক ৩৩ বছর পর ২০১২-এর ২ ডিসেম্বর চিকিৎসকদের অবহেলায় প্রাণ যায় সাংবাদিক সন্দীপ্তা চ্যাটার্জীর। ‘‘সন্দীপ্তাকে মনে রেখে’’ মহিলাদের স্বাস্থ্যসচেতনতার এক প্রয়াস।

কুসুমবাই ও সন্দীপ্তা যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় কুসুমবাই-সন্দীপ্তাকে মনে রেখে ‘‘মেয়েদের স্বাস্থ্য ভুবন’’।

মেয়েদের স্বাস্থ্যভুবন

বালবিধবা থেকে মহিলা ডাক্তার

ডা. হৈমবতী সেন-এর দিনলিপি থেকে

ষষ্ঠ পর্ব

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

'ডা. হৈমবতী সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৩) দিনলিপি থেকে' পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে, ২০১৬) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সংসার-সমাজ-প্রশাসন-সহ প্রায় এক সার্বিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হৈমবতীর একক-সংগ্রামকে অনুধাবন করতে গেলে তাঁর সময়কাল, পরিপার্শ্ব, সমাজ-সংস্কৃতিকেও খুঁটিয়ে জানতে হয়। সে কারণে দিনলিপি-র অনেক আপাত-সম্পর্কহীন খুঁটিনাটি বিবরণও যথাসম্ভব এ-লেখায় রেখে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমি এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে আমার বোধভাষ্যি সব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। যখনই ওই রাতের ছবিটি চোখে ভেসে উঠত তখনই মূর্ছা যেতাম। শাশুড়ি একদিন কড়া গলায় জানতে চাইলেন, 'কী হচ্ছে এসব—অলক্ষুণে কাণ্ড!' ছেলে বলল, 'এক রাতে ও একটা কড়া খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছে, তার পর থেকেই এরকম—হঠাৎ হঠাৎ ভিরমি খাচ্ছে।' আমার তো গালে হাত, মুখ হাঁ! লোকটা বলে কী! এই কি সত্যি কথা বলার নমুনা! এই ভদ্রলোকটি (যদি অবশ্য একে ভদ্রলোক বলা যায়!) একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট! এ কেমন ধারা মানুষ! লজ্জা লজ্জা! এই লোকটিই নাকি আমার স্বামী! লোকটার উপর ঘেন্নায় আমার কেমন গা-বমি করতে লাগল। মনে যে তোলপাড় চলছিল তা কথায় ফুটিয়ে তোলা আমার সাধ্যের বাইরে। শাশুড়ি বললেন, 'অনেক দিন হল ও এখানে আছে, মা-বাবার জন্যে নিশ্চয়ই মন কেমন করছে; সেজন্যেই ও অমন মুষড়ে আছে। সেজন্যেই ও এত ঘন ঘন ভিরমি খাচ্ছে। ওর বাপের বাড়ি থেকেও ওকে পাঠানোর অনুরোধ এসেছিল। আমি বলেছিলাম, যশোরে গিয়ে পাঠিয়ে দেব।' বাবু বললেন, 'খুব ভালো কথা, তাহলে ওর বাপের বাড়িতে একটা খবর পাঠালেই হয়।' সেদিনই বিকেলে আমার বরের জ্যাঠা খবরটা নিয়ে নীলগঞ্জে আমাদের বাড়িতে চলে গেলেন। পরের দিন বাবা নিজে আমাকে নিতে এলেন তাঁর বজরা নিয়ে। আমার বাপের বাড়ি যাওয়ার একটা শুভ দিনক্ষণ ঠিক হল। আমি বাবার সঙ্গে রওনা দিলাম। বাবার কাছে আমি সব আগল খুলে বলে দিলাম, কিচ্ছুটি লুকোলাম না। জবাবে বাবার মুখে রা-টি নেই, এমনকী একটা-আধটা হুঁ-হাঁ পর্যন্ত না। তাঁর থমথমে মুখে কে যেন কালির পোঁচ মেরে দিয়েছে। যখনই তিনি গভীর শোক পেতেন তখনই তাঁর মুখের ভাবটা অমন থমথমে কালি মাখা হয়ে উঠত। নৌকোয় রাতের রান্নাবান্না সারা হলে আমি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরে নৌকো ভেড়ানো হল। সে-দিনটা ওখানে হাটবার। সর্দার মাল্লা আর একটা বেয়ারা হাটে গিয়ে বিশাল বড়ো একটা মাছ নিয়ে এল, সঙ্গে নিয়ে এল নানারকম শাকসবজি। বাবা বললেন, 'আমরা বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া সারব। ষোলোটা দাঁড়ের সবকটাই যত জোরে পারো টানো যাতে যত তাড়াতাড়ি হয় বাড়ি পৌঁছোতে পারি।' কথাটা শোনামাত্রই মাল্লারা ঝাঁপিয়ে পড়ে হেঁইও-হো করতে করতে এমন জোড়ে দাঁড় টানতে লাগল যে আমরা কয়েক মিনিটেই খুলনা পৌঁছে গেলাম। ওখান থেকে প্রচুর পরিমাণে খাবার-দাবার ও দুধ কেনা হয়েছিল। ঢিমে আঁচে জ্বাল দিয়ে ওই দুধ মেরে প্রায় ক্ষীর করে ফেলল। বাড়ি পৌঁছোনোর অনেক আগেই আমরা ওই ক্ষীরে চিড়ে-মুড়কি মেখে জলখাবার সেরে নিয়েছিলাম।

বাড়িতে ফিরতে পেরে আমার ফুর্তি দেখে কে! এখানে ওখানে চরকিপাক খেয়ে বেড়াচ্ছিলাম, প্রাণ যেন খুশিতে উপচে উঠছিল। আমাকে অমন আনন্দে মাতোয়ারা হতে দেখে আর সবাইও খুব খুশি। কিশোরী জীবনে ওই আমার শেষ আনন্দঘন মুহূর্ত। জীবনে আর কোনোদিন মনের আনন্দে ঘোরাঘুরি করার সুযোগই আসেনি। মা-খুড়িমায়েরা যে কী আদর দিতেন! আমার সুখ-সুবিধা, ভালোমন্দর দিকে তাঁদের অষ্টপ্রহর

তীক্ষ্ণ নজর! সেখানে প্রায় কয়েক মাস ছিলাম। যখনই মনে পড়ত ওই বিদঘুটে দৃশ্যটা যা আমি দেখেছিলাম, আমার বুক ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যেত আর ভিরমি খেয়ে পড়তাম। আমাকে এমন ঘনঘন ফিট পড়তে দেখে লোকে বলতে শুরু করল ওর ওপর সতীনের পেতনি ভর করেছে। কেউ-বা বলল, 'আরে না, ওটা বেম্মদত্যির ভর।' আবার কেউ বলল, 'ওসব কিছু না, ওকে স্রেফ ভূতে ধরেছে।' আমাকে ভূতে পেয়েছে শুনে আতঙ্কে খেলুড়ে সাথিরা আমার আর ধারকাছ মাড়াত না। কী কষ্ট যে হত কী বলব! আমি অবাক হয়ে ভাবতাম—ভূতটা কোথায়? আমি তো ওকে কখনো দেখি না। তাহলে ওরা ভূত-টুত অমন আজেবাজে কথা বলে কেন? এইসব বিদঘুটে ভাবনায় আমার মনটা কেমন অসাড় হয়ে উঠছিল, ভেতর থেকে হাসি আনন্দ সব উবে গিয়েছিল। ভয়ংকর ভূতের ভাবনা যত বেশি আমাকে পেয়ে বসত, তত বেশি মনমরা হয়ে পড়তাম। একদিন মা বাবাকে ডেকে বললেন, 'জানি না মেয়েকে কীসে ভর করেছে। তুমি তো ওকে দেখছই না, কী করলে সেরে উঠবে, তা নিয়ে তোমার দেখছি কোনো মাথা ব্যথা নেই। ও তো দেখছি শুকিয়েই মরে যাবে।' বাবা বললেন, 'কী বললে? ভূতে ধরেছে।! ভূতই বটে! নরক! নরক! বাড়িটাকে একেবারে নরক করে তুললে সবাই মিলে! তোমাদের ঘ্যানঘ্যানানির চোটে মেয়েটা ঠিকমতো বেড়ে উঠতে-না-উঠতেই ওর হাত-পা বেঁধে গভীর জলে ফেলে দিয়েছি। এখন যদি ও মরে তো মরুক! আমাকে কিছু করার জন্য খবরদার আর একটা কথা বলবে না তুমি। এখন ওর জন্য তোমার দরদ একেবারে উথলে উঠছে! তোমার এখন মনে হচ্ছে যে ওর ওপর বুঝি কোনো প্রেতাত্মা ভর করেছে। আমিও বলছি ওকে যমে টানছে, মরুক, ও মরুক! বেঁচে থাকলে ওর কপালে আরও যে কত ভোগান্তি আছে!' ' কেন কী হয়েছে? হয়েছেটা কী? তুমি এরকম করে বলছ কেন? আমাদের এমন চমৎকার একজন জামাই! কত বড়োলোক! হ্যাঁ একটু বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে কী-বা এমন এসে যায়?' 'আলবাত এসে যায়! একটা মদো মাতাল, লম্পট, বেবুশ্যে বাড়ির দোরে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। এমন লোকের সঙ্গে কেউ কি তার মেয়েকে বিয়ে দেয়?' মা পালটা মুখিয়ে উঠলেন, 'অন্যেরটা তো সাতকাহন করে বলছ আর তোমার নিজের বেলা? তা নিয়েও কিছু তো বলো। কাচের ঘরে থেকে অন্যের দিকে ঢিল ছুঁড়ো না।' বাবা গর্জে উঠলেন, 'চুপ, একদম কথা বলবে না তুমি। অনেক ফারাক আমাদের মধ্যে। এমন একটা চাকরি করে লোকটা, কানাকড়ি পায় কি না সন্দেহ। মদের পয়সা জোটায় কোত্থেকে? মদই যদি খায় দু-বেলার খাবার জোটে কী করে? এই তো ওর হাল। ওর সঙ্গে আমার তুলনা!' মা আর কথা বাড়ালেন না। বাবা গজগজ করতেই লাগলেন, 'শোনো লোকনাথের ঝি, মদের পেছনে আমার যে পয়সা খরচ হয় তার একটা পাইপয়সাও জমিদারির আয় থেকে নয়। প্রজাদের থেকে আমি যে বাড়তি খাজনা আদায় করি তা দিয়েই আমার মদের খরচ উঠে যায়। বেশি কী আর বলব, ওই লোকটা আর ওর ঊর্ধ্বতন চোদ্দো পুরুষ মিলেও আমার সমান আয় করবার মুরোদ আছে? তোমরা সব্বাই মিলে আমাকে যে জব্বর ঘা-টা দিয়েছ তা আমার সইবে কি না জানি না। সোনার পিতিমের মতো মেয়েটা আমার, ওকে আমি এত ভালোবাসতাম; তোমাদের প্যানপ্যানানির জ্বালায় মেয়েটাকে আমার জলে ফেলে দিয়েছি। আর এখন তোমাদের মাথায় এক নতুন বদখেয়াল চেপেছে, ওর ওপর না কি প্রেতাত্মার ভর হয়েছে। তাই যদি হয়, হোক। মরুক মেয়েটা! বেঁচে থেকে কোন স্বর্গরাজ্য লাভ হবে?' এই বলে বাবা হনহন করে বারমহলে চলে গেলেন।

আমার ঘাড় থেকে কী করে ভূত নামানো যায়, সে-চিন্তায় অস্থির হয়ে মায়ের প্রাণবায়ু প্রায় বেরিয়ে যায় যায়। আমিও ভয়ে একেবারে শিঁটিয়ে ছিলাম। কী আজব ব্যাপার, যে ভূতটা আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে, তাকে আমি একটিবারের জন্যেও দেখি না কেন? ভূতটা দেখতে কেমন? আশেপাশে এত লোক থাকতে ওর আমাকেই পছন্দ হল, আমার ওপরই ভর করতে হল? কী করে বুঝব, ও ঠিক কোন সময়ে আসতে চায়? সবাই বলে, ভূতে ধরলে নাকি লোকে কাঁচা মাছ খায়। কিন্তু আমি তো কক্ষনো কাঁচা মাছ খাইনি। এইরকম যখন চলছে, ঠাকমা কোত্থেকে এক ওঝাকে ধরে নিয়ে এলেন। ওঝা এসেই বিচিত্র হুংকার-ফুৎকারে সকলকে একেবারে তটস্থ করে তুলল। জমিতে দাগিয়ে একটা ঘর আঁকল, আর তার মধ্যে আমাকে বসিয়ে দিল, বলল, 'তোর নাম বল।' বললাম, ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বার বার 'নাম কী' বলতে লাগল; মানে ও ভূতের আসল নাম জানতে চাইছিল। যতবার ও জিগেস করে ততবারই আমি আমার নাম বলি। ওঝা ঘন ঘন মাথা নাড়ে। ওর রাগ চড়তে থাকে। হঠাৎই ও আমাকে একটা ছোটো ঝ্যাঁটা দিয়ে বেদম মারতে থাকে। বলে, 'ওই ছেঁড়া জুতোটা মুখে করে তুলে নিয়ে যা, নইলে ফের ঝ্যাঁটার বাড়ি মারব।' এমন ইতরের মতো কুৎসিত আচারব্যাভার আর সইতে না পেরে আমি একলাফে সেখান থেকে ছুটে পালালাম। ওঝা ভেবেছিল, কোথায় আর যাবে, এখুনি ফিরে আসবে। আমি সটান বাবার কাছে গিয়ে সব কথা গড়গড় করে বলে দিলাম। বাবা আমাকে নিয়ে অন্দরমহলে এসে দেখেন, ওঝা হড়বড় করে জাদুমন্তর আওড়াচ্ছে আর বলছে, 'ও দেখতে-না-দেখতে ফিরে আসবে।' বাবা ওর পাছায় বেদম এক লাথি কষালেন, ও পড়ল মুখ থুবড়ে। রাগে গনগন করতে করতে বাবা বললেন, 'হতচ্ছাড়া, ধেড়ে বজ্জাত, তুই আমার বাড়ির অন্দরমহলে এসেছিস ঝাড়ফুঁক করে ভূত তাড়াতে? দাঁড়া, আজ এমন করে তোর ভূত তাড়াব যে আজই তোর জীবনের শেষ দিন। তোর একটা হাড়ও আস্ত থাকে তো কী বলেছি!' এই বলে বাবা ওকে বেধড়ক ধোলাই দিতে শুরু করলেন; সে বেদম পিটুনির ঠ্যালায় ওঝা বাবাজীবনের আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম। সে হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে বলে, 'বাবু আমি তো কোনো দোষ করিনি; মা-জননীরা আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাই আমি এসেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন বাবু।' 'হারামজাদা, এত বড়ো স্পর্ধা তোর, তুই আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলেছিস, ঝ্যাঁটাপেটা করেছিস? তোকে তো আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না, আজই তোর প্রাণ নিয়ে ছাড়ব।' এ-কথা শোনা মাত্র 'ওঝাকুল-শিরোমণি' ভয়ে বেতপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে বাবার পা-দুটো জড়িয়ে ধরল। বাবা যখন ওকে ফের মারবার জন্যে হাত তুলেছেন, আমি আতঙ্কে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলাম। বাবা হাত নামিয়ে নিলেন, ওঝাকে বললেন, 'আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা হতচ্ছাড়া পাজি নচ্ছার। তোকে আমি দশ টাকা জরিমানা করলাম। যদি না দিতে পারিস তবে তোর বাড়িঘরদোর সব ভেঙে চুরমার করে ধুলোয় মিশিয়ে দেব।' এতক্ষণ বাড়ির গিন্নিবান্নিরা ওঝার পাশেই দাঁড়িয়েছিল; এবার তাঁরা একে একে সব সটকে পড়লেন।

ওঝাও পেছনের দরজা দিয়ে পড়ি কি মরি করে দৌড়! বাবা ডাকলেন, 'বড়োমা!' বড়োমা বেরিয়ে এসে বললেন, 'কেন ডাকছ, বাছা?' 'কার মগজ থেকে এসব বেরিয়েছে?' আমার বড়ো ঠাকমা বললেন, 'আমাদের কয়েকজনের মনে হয়েছিল, ওর গায়ে কুবাতাস লেগেছে। সেজন্যেই আমরা ঝাড়ফুঁকের বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু বাছা, তোমার মেয়েটি তো মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ রণচণ্ডী! ওঝাটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে একছুটে তোমার কাছে গিয়ে নালিশ করল; অকারণে বেচারা কী মারটাই না খেল! একটা কাজের মতো কাজ হয়েছে বটে! ভয়ে শিঁটিয়ে গিয়ে আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পাওয়ার জোগাড়!' বাবা বললেন, 'মা, তোমার কি এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? মাথায় একফোঁটা ঘিলু থাকলে তুমি কি এক রত্তি মেয়েটাকে ওই নচ্ছারটাকে দিয়ে ঝ্যাঁটার বাড়ি খাওয়াতে পারতে? তোমাদের এতটুকু আত্মমর্যাদা বোধও কি থাকতে নেই? ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যদি এসব শোনে, কী ভাববে বলো তো! তোমাদের আর কী বলব আমি। তোমরা যদি আমার মা না হতে গুলি করে সব ক-টার খুলি উড়িয়ে দিতাম। একটা নোংরা ছোটোলোক আমার সদ্য-বিবাহিত মেয়ের গায়ে ঝাঁটার বাড়ি মারে, এতবড়ো আস্পর্ধা! বড়োমা, তোমাদের বোধবুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের বহর দেখে আমি তো থ! মা, এই শেষবারের মতো আমি তোমাদের একটা অনুরোধ করছি, আর কখনো করব না। এরকম ঘটনা আর দ্বিতীয়বার যেন না ঘটে।' বড়োঠাকমা বললেন, 'কিন্তু ও যে ঘন ঘন ফিট পড়ে, তার কী! এরকম চলতে থাকলে তো ও কোনো একদিন ধপ করে পড়বে আর মরবে।' বাবা বললেন, 'মরুক'! বলে আমার হাত ধরে বারমহলের দিকে জোর কদমে হাঁটা দিলেন।

এ-গুজবটাও ছড়িয়ে পড়ল: ভূতটা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার খেলুড়ে-সাথিরা সব ফিরে এল; আর কোনো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট আমাকে পোহাতে হয়নি। জনে জনে আমায় জিগেস করে, 'হ্যাঁ লো সই! ভূতটা তোর কী করেছে?' জবাব দিই, 'কিছুই তো করেনি।' এর পর বেশ কিছুদিন ভালোয় ভালোয় কেটে গেল, ফুর্তিতেই ছিলাম। চৈত্র মাসে শাশুড়ি কিছু উপহার-সহ খবর পাঠালেন, বৈশাখ মাসে তিনি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। মা সায় দিলেন। কয়েক দিন বাদে পয়লা বৈশাখ নববর্ষ উদ্‌যাপিত হল, নতুন বছরের হালখাতা খোলা হল; চাষি-প্রজাদের নগদ নজরানায় বড়ো বড়ো ঘট উপচে উঠল। তেসরা বৈশাখ আমার যাওয়ার দিন ঠিক হল। ঘড়া ঘড়া মশলা, ডাঁই-করা কাপড়চোপড় আনা হল। আমি ফের কাঁদতে শুরু করলাম। বামা-ঝি এসেছিল আমাকে নিতে। সে আমাকে বাবা-বাছা করে, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, 'কাঁদে না বাছা! আমরা আবার তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।'

তেসরা বৈশাখ বিকেলে রওয়ানা দিয়ে রাতটা থেকে গেলাম খুলনার বাড়িতে। পরের দিন সকালে মেজবাবু আমাকে একটা অচেনা লোকের সঙ্গে যশোর পাঠিয়ে দিলেন। পালকিতে চড়ে যশোর পৌঁছে আমি শাশুড়ির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। বসে পড়লাম তাঁর পাশেই। এখানকার হাল-হকিকত তো কিছুটা হলেও বুঝে গিয়েছি, সেজন্যে এবার আমি আগের থেকে অনেকটাই ধীরস্থির শান্ত থাকতে পেরেছিলাম। শাশুড়ি আমার সঙ্গে আসা উপহারের বহর দেখে ভারী খুশি; আমি বুঁচি আর পাঁচির জন্যে, বড়োদের জন্যেও কাপড়চোপড় উপহার এনেছি দেখে তিনি আরও খুশি। তিনি ছেলেকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'শোনো বাছা, মদন মজুমদারের ঝিয়ারি ছাড়া তোমার কোনো বউই এমন চমৎকার সব উপঢৌকন ঘরে আনেনি। এবার তোমার বিয়েটা হয়েছে খুব ভালো বংশে, ভালো ঘরে; কেবল মেয়েটার মাথায় অল্পস্বল্প ছিট আছে। তবে ও কিছু না, বয়স বাড়লে সেরে যাবে। আগের বার ওকে খুব অশান্ত, অস্থির লেগেছিল; এবার দেখছি বেশ শান্ত, নম্র। আমি তো ওর চেহারায় কোনো অমঙ্গুলে লক্ষণ দেখছি না। মনে তো হয় ও সরল মনের সাদাসিদে একটা মেয়ে বই আর কিছু নয়। তবে তোমার কপালে তো বউ টেঁকে না, দেখ, এই বউটা যাতে বেঁচেবর্তে থাকে—এর বেশি আর কী আশা করব!' 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, ও সহজে মরবে না; যা হবে, ও আমাকে শেষ করে দেবে।' এমন অলক্ষুণে কথা শুনে শাশুড়ি ভয়ে কেঁপে উঠলেন, বললেন, 'বালাই ষাট! অমন কথা বলতে নেই, ও তোর কী করেছে যে আর একজনের মেয়েকে নিয়ে অমন খারাপ কথা বলছিস?' ছেলে জবাব দিল, 'মনে এল তাই বললাম।' (চলবে)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

লেখক প্রাবন্ধিক ও অভিধানকার।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ফ্যান্টম (ভূতুড়ে) অঙ্গের ব্যথা ও আয়না থেরাপি

হাত কাটা গেছে। কাটা গেছে একদম গোড়া থেকে, সেই হাত নেই; দেখার তো কোনো কথাই ওঠে না, সেই হাতে কোনো কাজ করার প্রশ্নই নেই। কিন্তু সেই হাতে ব্যথা হয়। যাঃ, তাই আবার হয় নাকি? হয়, হয়, জানতি পার না! লিখেছেন **ডা. বিপ্লব**।

কারখানায় কাজ করতে গিয়ে মেশিনের মধ্যে ডান হাতটি ঢুকে যায় বিকাশবাবুর। তড়িঘড়ি করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বটে, কিন্তু হাতটি এমন ভাবে পিষে গিয়েছিল যে ডান হাতটি কনুই অব্দি কেটে বাদ দিতে বাধ্য হন হাসপাতালের চিকিৎসকরা। হাত কেটে যাবার পরও কিন্তু তার মনে হতে থাকে তার ডান হাতটি যেন রয়েছে এবং আগের মতো মুচড়ে যাওয়া অবস্থায় রয়ে গেছে। এবং তিনি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে থাকেন, ব্যথা ক্রমাগত বাড়তে থাকে, ব্যথার জ্বালায় তিনি রাত্রে ঘুমাতে পারতেন না। এর সঙ্গে সঙ্গে বিকাশবাবুর শরীরের বিভিন্ন অংশে (ডান দিকের গালে, পিঠে) কেবল হালকাভাবে স্পর্শ করলেই তিনি তার অনুপস্থিত হাতে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে থাকেন। তিনি দাড়ি কাটতে পারতেন না, স্নান করতে পারতেন না। সামান্য জলের ফোঁটা শরীরের ওই অংশগুলিতে পড়লে তার মনে হত যেন কেটে যাওয়া অস্তিত্বহীন ডান হাতের আঙুলগুলিতে কেউ হাতুড়ি দিয়ে মারছে। তাঁর পরিবারের কেউ, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু কেউই এই ভূতুড়ে হাতের কথা বিশ্বাস করতে চাইতেন

> মনে হত যেন কেটে যাওয়া অস্তিত্বহীন ডান হাতের আঙুলগুলিতে কেউ হাতুড়ি দিয়ে মারছে।

না। তাঁদের মনে হত এগুলো বোধ হয় বিকাশবাবুর মনের ভুল। কিন্তু এটা কোনো মনের ভুল নয়, বিশেষ শারীরিক সমস্যা—ডাক্তারি পরিভাষায় এই রকম শরীর-না-থাকা কিন্তু ব্যথা-থাকা 'অশরীরী ভূতুড়ে' অঙ্গকে বলা হয় ফ্যান্টম অঙ্গ।

১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেঞ্চ মিলিটারি সার্জেন আম্ব্রোস পারে প্রথম এই ধরনের ব্যথার কথা উল্লেখ করলেও ১৮৭২ সালে মিচেল সাহেব প্রথম এই 'ফ্যান্টম লিম্ব' শব্দটি ব্যবহার করেন। শরীরের যে অংশটি বর্তমানে আর নেই, সেই অশরীরী অস্তিত্বহীন অংশ থেকে উৎপন্ন ব্যথা বা অনুভূতিকেই আমরা বলি ফ্যান্টম অঙ্গের ব্যথা বা অনুভূতি।

অঙ্গবিচ্ছেদ হয়েছে এমন মানুষদের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষের এই ধরনের ব্যথা বা অনুভূতি হয়। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় এই ধরনের ব্যথায় বেশি ভোগেন। গবেষণায় দেখা গেছে যারা অপারেশনের আগে অনেকক্ষণ ধরে ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যথার প্রাদুর্ভাব বেশি। তাছাড়া মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অবসাদ ইত্যাদির সঙ্গেও এই অশরীরী ভূতুড়ে ব্যথার সম্পর্ক রয়েছে। হাত, পা, দাঁত, জিভ, নাক, স্তন, লিঙ্গ ইত্যাদি অঙ্গ কেটে বাদ যাওয়ার পর এই ধরনের অশরীরী ব্যথা হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপারেশনের দু-সপ্তাহের মধ্যে এই ধরনের জ্বালা, ব্যথা অনুভূত হয় এবং পরবর্তীকালে কমে যায়। কিন্তু ৫০% ক্ষেত্রে এই ব্যথা সাত বছরের বেশি এমনকী অনেক ক্ষেত্রে সারাজীবন ধরে চলতে থাকে।

ভূতুড়ে অঙ্গের কারণ

চিকিৎসা-গবেষকরা অনেকদিন ধরেই এই ভূতুড়ে ব্যথার রহস্যভেদ করার চেষ্টা করে চলেছেন। সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা না করা গেলেও কিছু কারণ জানা গেছে:

১. প্রান্তিক স্নায়ুতন্ত্রে পরিবর্তন: অঙ্গ-বিচ্ছেদের সময় স্নায়ুতন্ত্রগুলি যেখান থেকে কাটা যায়, সেখানে তন্ত্রগুলো বৃদ্ধি পেয়ে ছোটো টিউমারের মতো তৈরি হয়, এদের বলে নিউরোমা। স্নায়ুতন্ত্র বেয়ে ব্যথা বা যেকোনো অনুভূতি স্নায়ুকোষের পর্দার তড়িতাধান-এর পরিবর্তন বা স্পন্দন হিসেবে বাহিত হয়, আর এই তড়িতাধান-পরিবর্তনে কোষপর্দার মধ্যে দিয়ে সোডিয়াম-এর চলাফেরা করার একটা ভূমিকা আছে। কোষপর্দার যেখান দিয়ে যায় সোডিয়াম তাকে বলে সোডিয়াম চ্যানেল। ভূতুড়ে ব্যথার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, নিউরোমাগুলিতে সোডিয়াম চ্যানেলগুলোর সংখ্যা ও কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্নায়ুস্পন্দন তৈরি হতে থাকে। তার ফলে ওই অংশ থেকে ব্যথার অনুভূতি ক্রমাগত ওই স্নায়ুতন্তু বরাবর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যেতে থাকে। তাই কোনোরকম যন্ত্রণাদায়ক উদ্দীপনা ছাড়াই ওই ব্যক্তি ব্যথা অনুভব করতে থাকেন।

২. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রধানত দু-টি স্তরে পরিবর্তন আসে, সে দু-টি হল সুষুম্নাকাণ্ড এবং মস্তিষ্ক।

সুষুম্নাকাণ্ডে যে স্নায়ুতন্ত্রগুলি মস্তিষ্কে ব্যথা বয়ে নিয়ে যায় সেগুলি সংখ্যায় বেড়ে যায় ও তাদের সংযোগ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। সব মিলিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড কেন্দ্রীয়ভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং সামান্য স্পর্শ

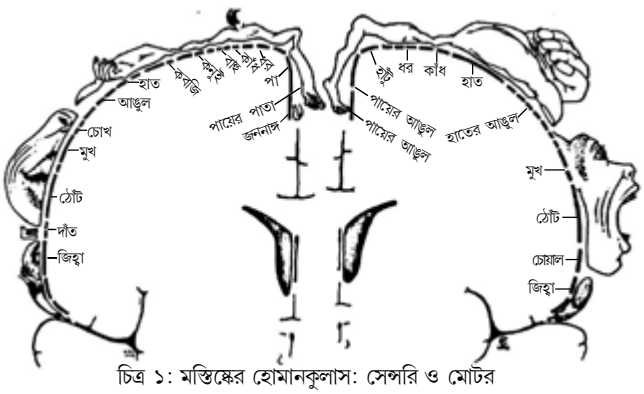

চিত্র ১: মস্তিষ্কের হোমানকুলাস: সেন্সরি ও মোটর

অনুভূতিও প্রচণ্ড ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে মস্তিষ্ক থেকে

কিছু নিম্নগামী স্পন্দন ব্যথা দমন করার জন্য সুষুম্নাকাণ্ড বরাবর নামে। সুষুম্নাকাণ্ড কেন্দ্রীয়ভাবে সংবেদনশীল হয়ে পড়লে নিম্নগামী দমনকারী স্পন্দনগুলিও দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলস্বরূপ ব্যথা আরও তীব্র হয়।

আমাদের শরীরে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অনুভূতি গ্রহণ এবং সেই অঙ্গের সঞ্চালন ঘটানোর জন্য মস্তিষ্কে নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ আছে (চিত্র ১)। এখন কোনো অঙ্গ-বিচ্ছেদ হলে ওই অঙ্গের জন্য মস্তিষ্কের বরাদ্দ জায়গাটি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দ্বারা অধিগৃহীত হয়। মস্তিষ্কের এই পরিবর্তনকে বলা হয় কর্টিক্যাল রিঅরগানাইজেশন বা মস্তিষ্কবল্কলের পুনর্বিন্যাসকরণ। যেমন কোনো ব্যক্তির যদি হাত কাটা যায় তাহলে ওই হাতের জন্য বরাদ্দ মস্তিষ্কের অংশটি ওই দিকের গাল বা পিঠ এর জন্য বরাদ্দ অংশ দ্বারা অধিগৃহীত হয়। এই জন্যই বিকাশবাবু দাড়ি কাটতে গেলে বা পিঠে সামান্য জলের ফোঁটা পড়লেই অসম্ভব ব্যথা অনুভব করতেন।

চিত্র ২. ফ্যান্টম অঙ্গের ব্যথার রোগী মিরর থেরাপি অনুশীলন করছেন

৩. মেলজ্যাক-এর নতুন **নিউরোম্যাট্রিক্স ও নিউরোসিগনেচার** তত্ত্ব অনুযায়ী চেতনা, সংবেদন এবং আবেগ, এই তিন প্রবেশ করে 'নিউরোম্যাট্রিক্স' অর্থাৎ স্নায়ুতন্তুর জালে, সেখানে প্রক্রিয়াকরণ হয় এবং তৈরি করে 'নিউরোসিগনেচার' যার মধ্যে আছে ব্যথা অনুভূতি, কর্ম পরিকল্পনা, চাপনিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন ব্যবস্থা নেবার পরিকল্পনা। কোনো অঙ্গ বিচ্ছেদ হলে যেহেতু সেই অনুপস্থিত অঙ্গ থেকে কোনো প্রকার সংবেদন নিউরোম্যাট্রিক্সে আসে না, সেহেতু অস্বাভাবিক নিউরোসিগনেচার তৈরি হয়, ফলস্বরূপ ব্যথা অনুভূতি প্রচুর বেড়ে যায়।

৪. অঙ্গবিচ্ছেদ (অ্যাম্পুটেশন) অপারেশনের পূর্বে সেই অংশে চোট বা আঘাতের কারণে সেই অঙ্গের নড়াচড়া বা সঞ্চালন করতে গেলেই প্রচুর ব্যথা হয়। অঙ্গের সঞ্চালন এবং ব্যথার এই যে সম্পর্ক, তা ওই ব্যক্তির মস্তিষ্কে স্মৃতি হিসাবে গেঁথে থাকে। অঙ্গচ্ছেদের পরবর্তীকালেও যখনই ওই অঙ্গসঞ্চালনকারী স্নায়ুতন্তুগুলি উত্তেজিত হয় তখনই পূর্ব স্মৃতির কারণে ব্যথা অনুভূত হয় অঙ্গের বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়াই।

৫. মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অবসাদ, ক্লান্তি ইত্যাদির সঙ্গে এই প্রকার ব্যথা সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে।

ভূতুড়ে অঙ্গের চিকিৎসা

এই ধরনের ব্যথা প্রায় দুরারোগ্য। নীচে বিভিন্নরকমের চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলা হল; তবে অনেক সময়ই আমরা এই ভূতুড়ে ব্যথা কমাতে পারি না।

১. ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা: ব্যথা কমানোর জন্য যেসব ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্যারাসিটামল, নন-স্টেরয়েড অ্যান্টিইনফ্লামেটরি ড্রাগস (আইবুপ্রোফেন, ডাইক্লোফেনাক), ওপিয়ড ওষুধ, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট (অ্যামিট্রিপটিলিন, ডুলোক্সেটিন), অ্যান্টিকনভালসেন্ট (গাবাপেন্টিন, প্রিগাবালিন), কিটামিন, লিডোকেন (সরাসরি শিরায় প্রদানের মাধ্যমে), ক্যালসিটোনিন, ক্লোনিডিন ইত্যাদি।

অনেক সময়ই আমরা এই ভূতুড়ে ব্যথা কমাতে পারি না।

২. ওষুধ ছাড়া চিকিৎসা পদ্ধতি: ট্রান্স-কিউটেনিয়াস ইলেকট্রিক নার্ভ স্টিমুলেশন, স্পাইনাল কর্ড স্টিমুলেশন।

৩. শল্যচিকিৎসা এবং ইন্টারভেনশন: পুনরায় অপারেশন (অঙ্গের যে অংশটি অপারেশনের পর অবশিষ্ট থাকে তার সংস্কার), নার্ভ ব্লক, সিম্প্যাথেটিক ব্লক ইত্যাদি।

৪. মিরর থেরাপি: আধুনিক সময়ে এই ধরনের ব্যথা কমানোর জন্য একটি অভিনব চিকিৎসাপদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যেটি হল 'মিরর থেরাপি' অর্থাৎ আয়না দ্বারা চিকিৎসা। ফ্যান্টম ব্যথার একটি প্রধান কারণ হল অঙ্গ থেকে আগত সংবেদন ও অঙ্গসঞ্চালনে অসামঞ্জস্য। আয়নার মাধ্যমে এই অসামঞ্জস্যকে কম করার চেষ্টা করা হয়। রোগী আয়নার সামনে তার সুস্থ হাত বা পা রাখেন। রাখার কায়দা এমন হয় যে আয়নায় তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বটি তার উলটোদিকের হাত বা পা (অর্থাৎ কাটা বা বাদ

পড়ে যাওয়া হাত বা পা) মনে হয়। রোগী আয়নায় তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বকে দেখে সত্যিকারের হাত মনে করেন (যদিও বাস্তবে ওই দিকের অঙ্গটি অনুপস্থিত) এবং সেটার ব্যায়াম করেন, যে অংশ মুচড়ে রয়েছে সেটাকে সোজা করার চেষ্টা করেন (চিত্র ২)। আয়নার থেকে চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে খবর পৌঁছোতে থাকে, আর সেই খবরের দুটো অংশ—কেটে যাওয়া অঙ্গটির সংবেদন এবং তার সঞ্চালন; এই দু-টো খবরের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে। 'মিরর থেরাপি'-র কর্মপদ্ধতির মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল 'মিরর নিউরোন'। যখন আমরা কাউকে কিছু কাজ করতে দেখি তখন আমাদের মস্তিষ্ক ওই একই কাজ করার জন্য মিরর নিউরোনগুলি উত্তেজিত হয়। আয়নার মাধ্যমে এই বিশেষ স্নায়ুতন্তুগুলিকে উত্তেজিত করে সংবেদন এবং সঞ্চালনের মধ্যে ব্যথাবিহীন সামঞ্জস্য স্থাপন করা হয়।

ডা. ভি. এস. রামচন্দ্রন ১৯৯২ সালে প্রথম ফ্যান্টম ব্যথার চিকিৎসার জন্য মিরর থেরাপির ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে স্ট্রোকের রোগীদের অঙ্গসঞ্চালন প্রশিক্ষণে, হাতে শল্যচিকিৎসার পর হাতের জড়তা কাটাতে, কমপ্লেক্স রিজিওনাল পেন সিনড্রোমে (সামান্য চোট লাগলেও স্বাভাবিক সময়ের পরও ব্যথা থেকে যাওয়া বা বাড়তে থাকা), ব্র্যাকিয়াল প্লেক্সাসে স্নায়ুতন্তুর আঘাতে এই আয়না চিকিৎসা সফলভাবে ব্যবহার করা হয়। সহজ, কম খরচাসাপেক্ষ, গৃহকেন্দ্রিক এই চিকিৎসাপদ্ধতি খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বর্তমানে এই অশরীরী ভূতুড়ে ব্যথার জন্য একসঙ্গে বহুপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ওষুধের দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, শিরায় লিডোকেন প্রয়োগ করা হয়, সিম্প্যাথেটিক ব্লক করা হয়, ফিজিয়োথেরাপি করা হয়, আয়না চিকিৎসা করা হয়, মানসিক কাউন্সেলিংও করা হয়। বহুপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ব্যথা কমিয়ে রোগীকে সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনক্ষম করে তুলে তাকে জীবন সংগ্রামে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

বহুপ্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে ব্যথা কমিয়ে রোগীকে সামাজিকভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনক্ষম করে তুলে তাকে জীবন সংগ্রামে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ডা. বিপ্লব এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটি ক্লিনিকে কাজ করেন।

Advt.

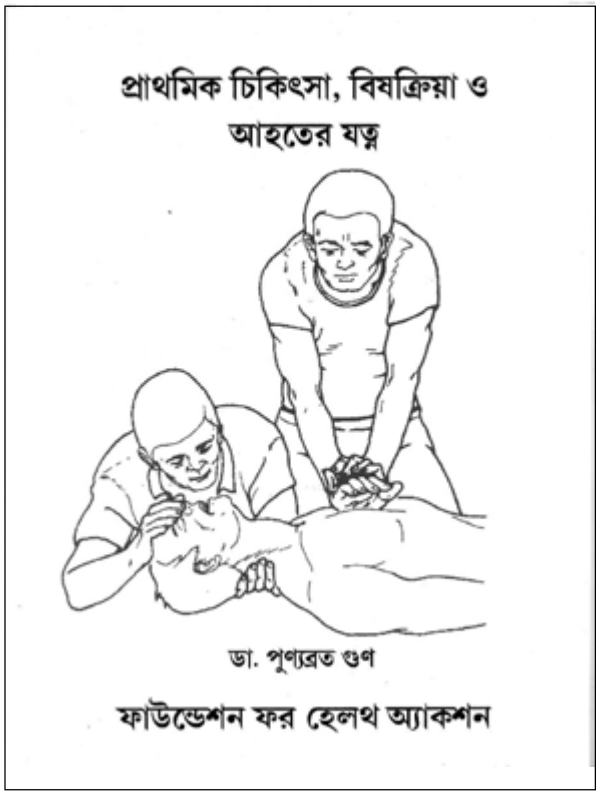

সাপ কামড়ের সমস্যা

ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদার

সাপ কামড়ের সমস্যা

২০০৯-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO সাপের কামড়কে 'উপেক্ষিত ট্রপিক্যাল রোগ' হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। আমরা তারও দু-বছর আগে অর্থাৎ ২০০৭ সাল থেকে এটা কর্তৃপক্ষের নজরে আনার চেষ্টা করছি। এরপর কিছু ব্যক্তি এবং কিছু সংগঠনের ক্রমাগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় অবশেষে ২০১১-তে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য বিভাগের কিছু আমলা বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসেন।

২০১২-য় স্বাস্থ্য বিভাগ এ-বিষয়ে অনেকগুলো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। জাতীয় ন্যাশনাল গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (ন্যাশনাল রুর‍্যাল হেলথ মিশন) সাপের কামড়ের জন্য একটা তহবিল-বরাদ্দ মঞ্জুর করে। সাপের কামড়ের চিকিৎসার জন্যে রাজ্যে একটা নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত মেডিক্যাল অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্যে একটা ৩৬ পাতার পুস্তিকা তৈরি হয়। একটা পোস্টার তৈরি হয় সাপে-কামড়ানোর চিকিৎসা-ব্যবস্থার নির্দেশিকা হিসেবে। এই ৬ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া ভিনাইল বোর্ডের পোস্টার রাজ্যের সমস্ত বিপিএইচ সি (ব্লক জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র), সাব ডিভিশনাল বা মহকুমা হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালগুলিতে পাঠানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই বোর্ডটির গুরুত্বকে অবহেলা করে। ২-৩ বছরের মধ্যে ৯০ শতাংশ হাসপাতালের দেওয়ালে এই বোর্ডটির টিকিও খুঁজে পাওয়া যায় না।

যদিও প্রায় ৫০০০-এর ওপর অর্থাৎ ৫০ শতাংশ মেডিক্যাল অফিসারকে সাপে-কামড়ানোর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল তবু বাকি আরও ৫০ শতাংশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার নতুন মেডিক্যাল অফিসার চাকরিতে যুক্ত হন। তারা প্রশিক্ষণ পাননি।

সবথেকে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে এমবিবিএস পাঠক্রমে 'সাপের কামড়' পড়ানোই হয় না। ডাইরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন [DME (Director of Medical Education)] এবং সমস্ত কলেজের প্রিন্সিপালদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সাপের কামড়কে গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রমে ঢোকানো হয়নি। মেডিক্যাল ছাত্রদেরও পড়ানোই হয়নি, তার ফলে গ্রামীণ হাসপাতালে নতুন চাকরি পাওয়া মেডিক্যাল অফিসাররা সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন।

অন্যদিকে ডেবরা, সিঙ্গুর, ভাতার গ্রামীণ হাসপাতালে প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল অফিসাররা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সব রকমের সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করছেন। সুফলও পাচ্ছেন।

আমাদের পর্যবেক্ষণ হল ASHA বা ANM-এর মতো ফিল্ড স্টাফদের ট্রেনিং দিয়েও সাপের কামড়ের চিকিৎসাতে অনেক সাহায্য হয়। সাধারণ মানুষকেও সজাগ করে তুলতে হবে যে সাপের কামড়ের চিকিৎসা ১০০ শতাংশ সফলভাবে গ্রামীণ হাসপাতালেও করা সম্ভব।

আমরা দেখেছি গ্রাম থেকে দূরে শহরের হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। তাই আমরা একটা 'রুল অফ হানড্রেড' বা 'একশোর নিয়ম' করেছি। অর্থাৎ সাপে কামড়ানোর ১০০ মিনিটের মধ্যে যদি ১০০ মিলিলিটার (১০ ভায়াল) অ্যান্টি স্নেক ভেনম রোগীর শিরায় চালানো যায় তো ১০০ শতাংশ রোগী বেঁচে যাবেন।

গত ৭-৮ বছরের নিরলস পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ইন্ডোর বেড আছে এরকম সব সরকারি হাসপাতালে সাপের কামড়ের চিকিৎসার এক সম্পূর্ণ পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

সুদূর কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতাল, ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতাল এবং আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালের মতো জায়গাতেও এখন ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট আছে।

এখন সাপ, সাপের কামড় ও তার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে কিছু মূল তথ্য জানা যাক।

* * *

গত ১২ অক্টোবর ২০১৫, নতুন দিল্লির মুনিরকায় NHSRC ভবনে, জাতীয় আদর্শ চিকিৎসাবিধি দল-এর সর্পদংশন বিষয়ক কমিটির একটি মিটিং হল। দেরিতে হলেও, জাতীয় স্তরে সাপ কামড়ের সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে এটাই আশার কথা।

একজন বাঙালি হিসেবে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি এ জন্য যে, আমাদের রাজ্যের আদর্শ চিকিৎসাবিধি ২০১২ সালেই তৈরি হয়েছে।

২০১২-১৩ আর ২০১৫-১৬ দুই দফায় এ রাজ্যের কয়েক হাজার সরকারি চিকিৎসককে সাপ কামড়ের চিকিৎসার বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের সুফলও আমরা দেখতে পেয়েছি।

আমাদের মেদিনীপুর জেলার ডেবরা আর সোনাখালি গ্রামীণ হাসপাতালে এখন সবরকম বিষধর সাপের কামড়ের চিকিৎসা হচ্ছে। এই দু-টি গ্রামীণ হাসপাতালের সাফল্য শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক আদর্শ। যথা সময়ে চিকিৎসা করলে, যেকোনো সাপ কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি গ্রামীণ হাসপাতালই যথেষ্ট তা এই দুই হাসপাতাল বার বার প্রমাণ করছে।

সাপ কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'রুল অফ ১০০' অত্যন্ত মূল্যবান। যেকোনো বিষধর সাপের কামড়ের পর ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০০ মিলি লিটার (অর্থাৎ ১০টি অ্যান্টিভেনাম) দিতে পারলে ১০০% সাফল্য পাওয়া যাবে।

২০১৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকের একটি ঘণ্টার কথা আমাদের সবার জানা দরকার। ১৯ বছর বয়সের এক যুবক খালে নেমে পানা পরিষ্কার করছিল। বেলা ১১টা নাগাদ কিছু একটা তার বাম বগলের সামনের দিকে কামড়ায়। কাজ সেরে স্নান খাওয়া করে ছেলেটি যখন বিশ্রাম করছিল তখন শরীর একটু অসুস্থ লাগে। বিকেল সাড়ে চারটার পর সে একবার বমি করায় স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে দেখানো হয়। ওই ডাক্তারবাবুই প্রথম বলেন যে ওকে চন্দ্রবোড়া সাপে কামড়েছে। এরপর ওকে হরিপাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

হরিপাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওকে প্রথম ডোজ দশটি অ্যান্টিভেনাম দেওয়া হয় সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। তারপর কিডনি আক্রান্ত হয়েছে বুঝে ওকে কলকাতায় পাঠানো হয়। কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ১৫-১৬ দিন ডায়ালিসিস করার পর সে সুস্থ হয়।

২০১৪ সালের জুলাই মাসে তারকেশ্বরের বৈদ্যপুর গ্রামীণ হাসপাতালে কল্যাণ নামের এক যুবক ওই চন্দ্রবোড়া সাপ কামড়ের পর চিকিৎসা পায়। কামড়ের মাত্র ২০ মিনিট পর কল্যাণ হাসপাতালে এসেছিল, তাই সময় মতো অ্যান্টিভেনাম দেওয়া হয়; কিডনির কোনো ক্ষতি হওয়ার আগেই চিকিৎসা হওয়ায় কল্যাণকে কলকাতায় যেতেও হয়নি।

কল্যাণ-এর মতো সচেতনতা এখনও ৮০% লোকের নেই। এজন্য 'ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা' 'কোচবিহার স্নেক রেসকিউ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' 'শিমুলতলা কনজারভেশনিস্ট' প্রভৃতি বহু সংস্থা এবং প্রধান শিক্ষক সুব্রত বুরাই বাবুর মতো কিছু ব্যক্তি নিরলসভাবে কাজ করছেন।

এরপর আমি যা লিখেছি, কতজন শিক্ষিত মানুষ তা জানেন?

পশ্চিমবাংলার সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে অ্যান্টিভেনাম দেওয়া হয়

সত্যি কথা বলতে কি, গত কয়েক বছরে সাপ কামড়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এখন সাপ কামড়ের চিকিৎসার জন্য 'সিনড্রোমিক অ্যাপ্রোচ' অর্থাৎ রোগ লক্ষণ দেখে চিকিৎসার পদ্ধতি মেনে চলা হয়। *এতে সাপটিকে চেনা জরুরি নয়*। বিষধর সাপ কামড়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখেই নিশ্চিতভাবে বোঝা সম্ভব কী জাতীয় সাপ কামড়েছে, তার জন্য কী চিকিৎসা দরকার।

সাপ বা সন্দেহজনক কিছু কামড়ালে সেই রোগীকে কীভাবে চিকিৎসা করা দরকার সে বিষয়ে সরকারিভাবে একটি ফ্লো চার্ট তৈরি করা হয়েছে, ২০১২-র মে মাসেই। চার্টটি দেখলে বোঝা যায়, এই চিকিৎসা-পদ্ধতি খুবই সহজ। এই ফ্লো চার্ট, একটি ৬ ফুট বাই ৪ ফুট বোর্ড আকারে রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে টাঙানো থাকছে।

আমরা প্রথমে এ রাজ্যের মাত্র ৬টি বিষধর সাপকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া জরুরি যে একজন প্রাণীবিদ্যা-বিশারদের মতো বিস্তৃত জানার দরকার নেই। চিকিৎসার জন্য সামান্য কয়েকটি জিনিস জানতে হয়।

বিষধর সাপ কামড়ের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখেই নিশ্চিতভাবে বোঝা সম্ভব কী জাতীয় সাপ কামড়েছে, তার জন্য কী চিকিৎসা দরকার।

চিকিৎসার পরিভাষায় সাপেদের দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নিউরোটক্সিক আর হেমোটক্সিক। নিউরোটক্সিক সাপ আবার দুই রকম, ফণাযুক্ত আর ফণাহীন। ফণাযুক্ত গোখরো আর কেউটে চিকিৎসার জন্য এক-ই সাপ। এদের বিষ নিউরোটক্সিক। ফণাযুক্ত এই সাপ দু-টিকে আমরা সবাই চিনি। এদের কামড়ের লক্ষণ হল ভয়ংকর ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা। ফণাযুক্ত শঙ্খচূর বা কিংকোবরাও এই জাতীয় সাপ, তবে এ রাজ্যে বিরল।

নিউরোটক্সিক সাপ কামড়ের রোগী ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়বে, দুই চোখের পাতা পড়ে আসবে। রোগী ঝাপসা দেখবে। কথা জড়িয়ে আসবে।

ফণাহীন নিউরোটক্সিক সাপ কামড়ে ব্যথা ফোলা হবে না। চোখের পাতা পড়ে আসা এ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণ। এখানেও কথা জড়িয়ে আসবে আর রোগী ঝিমিয়ে পড়বে। ফণাহীন নিউরোটক্সিক সাপ হল কালাচ আর শাখামুটি। এদের ইংরেজিতে বলা হয় ক্রেট।

শাখামুটি সাপটি চেহারায় বেশ বড়ো, গায়ের রং উজ্জ্বল হলুদ আর কালোর পর পর ব্যান্ড। খুব-ই শান্ত প্রকৃতির এই সাপ সাধারণত মানুষকে কামড়ায় না। পরিবেশ-এর ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই সাপ খুব জরুরি; কারণ এরা ভয়ংকর কালাচ সাপ খেয়ে তাদের সংখ্যা কমায়।

কালাচ একটি ভংয়কর বিষধর রহস্যময় সাপ। ফণাহীন মাঝারি চেহারার এই সাপটির গায়ের রং কালো; কালোর উপর সরু সরু সাদা ব্যান্ড বা চুড়ি লেজের শেষ পর্যন্ত থাকে। দিনের বেলায় এদের প্রায় দেখাই যায় না।

প্রায় সবক্ষেত্রেই এরা রাত্রে খোলা বিছানায় কামড়ায়। এরা কেন খোলা বিছানায় উঠে আসে তা এখনও অজানা। এরা রহস্যজনক সাপ এজন্যই যে এদের কামড়ে কোনো ব্যথা হয় না, অতি সূক্ষ্ম কামড়ের দাগ প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যায় না। রাত্রে বিছানায় কামড়ের ২ থেকে ২০ ঘণ্টা পর নার্ভ বিষের লক্ষণ দেখা যায়। বিচিত্র সব রোগলক্ষণ নিয়ে রোগী হাসপাতালে আসে। ভোর রাত্রে পেট ব্যথার জন্য ঘুম ভেঙে যাওয়া সবথেকে বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া গলা ব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, খিঁচুনি, শুধু মাত্র দুর্বলতা অনুভব করা এরকম বিচিত্র সব লক্ষণ নিয়ে রোগী আসতে পারে। এসব লক্ষণ-এর সঙ্গে আগের রাত্রে মেঝেতে ঘুমানো এবং পরে দুই চোখের

পাতা পড়ে আসছে দেখলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় কালাচ সাপে কামড়েছে।

উত্তরবঙ্গে আরও দুই রকম ফণাহীন বিষধর আছে; সিন্ধু কালাচ আর কৃষণ কালাচ। এরা সহজে কামড়ায় না; কিন্তু কামড়ালে বাঁচানো মুশকিল।

ছয় নম্বর সাপটি হল চন্দ্রবোড়া। এটিই পশ্চিমবাংলার একমাত্র হেমোটক্সিক সাপ। বর্তমানে এই চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়েই সব থেকে বেশি মানুষ মারা যাচ্ছেন। এই সাপটি মোটা চেহারার, বাদামি বা কাঠ রং-এর ফণাহীন সাপ। গায়ে চন্দন হলুদ চাকা চাকা দাগ দিয়েই এদের সহজে চেনা যায়। উত্তর বাংলায় চন্দ্রবোড়া সাপের সংখ্যা নগণ্য। চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে রোগীর রক্ত তঞ্চন-এর গণ্ডগোল হয়। চিকিৎসায় দেরি হলে রোগীর কিডনি নষ্ট হতে থাকে, মূত্রে রক্ত এসে যায়। এর কামড়েও গোখরো কামড়ের মতো ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা প্রাথমিক লক্ষণ। দাঁতের মাঢ়ী, পুরোনো ঘা বা কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া রক্ততঞ্চন-এর গণ্ডগোল-এর লক্ষণ। চন্দ্রবোড়া একমাত্র হেমো-টক্সিক সাপ যার কামড়ে চোখের পাতা পড়ে আসে।

ফ্লো চার্ট-এর ব্যাখ্যা

সাপ কামড় বা যেকোনো সন্দেহজনক কামড়ের রোগী হাসপাতালে এলেই তাকে ভর্তি করে নিতে হবে। প্রথমেই একটি সাধারণ স্যালাইন আস্তে চালিয়ে দেওয়া হবে। আর দেওয়া হবে একটি টিটেনাস ভ্যাকসিন। রোগীর শ্বাসকার্য ঠিকমতো চলছে কিনা দেখে নিতে হবে। এ ব্যাপারটা সবার আগে দেখা দরকার।

এরপর আমরা দেখব কোনোরকম বিষের লক্ষণ আছে কি না। প্রচণ্ড ব্যথা আর ক্রমবর্ধমান ফোলা থাকলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় বিষধর সাপে কামড়েছে। দ্রুত একের চার মিলিলিটার (১/৪ এম এল) অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশন চামড়ার তলায় দিতে হবে (এবং বাকি অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জে টানা থাকবে), সঙ্গে সঙ্গে ১০টি এভিএস ওই চালু স্যালাইন-এর বোতলে মেশানো হবে। এবার ওই এভিএস যুক্ত স্যালাইন দ্রুত চালানো হবে; এক ঘণ্টার কম সময়ে ১০টি এভিএস রোগীর রক্তে ঢোকা চাই। কোনোরকম বাঁধন থাকলে এভিএস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা খুলে দেবেন। পরবর্তী উন্নতি লক্ষ করে পরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ধীর গতিতে স্যালাইন চলতে থাকবে ২৪ ঘণ্টা। কালাচ কামড়ের ক্ষেত্রে ব্যথা ফোলা থাকবে না, চোখের পাতা পড়ে আসছে দেখলেই এভিএস দিতে হবে।

‘চোখের পাতা পড়ে আসছে’, এটি একটি অত্যন্ত জরুরি লক্ষণ।

‘চোখের পাতা পড়ে আসছে’, এটি একটি অত্যন্ত জরুরি লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখলেই একটি অ্যাট্রোপিন ইঞ্জেকশন শিরায় (আইভি) দিতে হবে; তারপর তিন সি সি (৩ এম এল) নিওস্টিগমিন ইঞ্জেকশন শিরায় বা আই এম দিতে হবে। এই দু-টি ইঞ্জেকশন একমাত্র ফণাযুক্ত সাপের কামড়ে কাজ করে। ফণাযুক্ত সাপের ক্ষেত্রে এই দু-টি ইঞ্জেকশন দু-ঘণ্টা পর আবার দেওয়া যায়।

সাপ কামড়ের একমাত্র জীবনদায়ী ওষুধ এভিএস, ঘোড়ার সিরাম থেকে তৈরি, তাই এর থেকে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এজন্য এভিএস যুক্ত স্যালাইন চলবার সময় রোগীর উপর সতর্ক নজর রাখতে হবে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কোনোরকম লক্ষণ চোখে পড়লেই সিরিঞ্জে টানা অ্যাড্রেনালিন (০.৫ এমএল) আই এম (পেশিতে) দিতে হবে। এ সময় স্যালাইন সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে। ৭-৮ মিনিট-এর মধ্যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া চলে যাবে; তখন আবার স্যালাইন চলবে। খুব কম ক্ষেত্রেই ১৫ মিনিট পর আর একবার অ্যাড্রেনালিন ইঞ্জেকশন দরকার হয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার লক্ষণ-গুলি হল আমবাত, মাথা চুলকানো, হঠাৎ করে রক্তচাপ কমে যাওয়া, বমি কিংবা পেট ব্যথা। খুব কম ক্ষেত্রে শ্বাস কষ্ট দেখা যায়।

দেখুন আমি কোথাও স্কিন টেস্ট-এর কথা বলছি না। আগে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে কি না জানার জন্য ওই রকম পরীক্ষা করা হত; এখন এটা পরীক্ষিত সত্য যে ওইরকম পরীক্ষা অর্থহীন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ২০১০ সালের নির্দেশিকায় স্কিন টেস্ট বাতিল করা হয়েছে।

দেখুন আমি বিষের লক্ষণ হিসাবে কোথাও সাপ চেনা কিংবা কামড়ের দাগ দেখার কথা বলিনি। *প্রথম ১০টি এভিএস দেওয়ার সময় কোন জাতীয় সাপ বা কী জাতীয় বিষ আলাদা করার দরকার নেই।* সবক্ষেত্রেই একই চিকিৎসা। এমনকী বাচ্চাদেরও ওই ১০টি এভিএস।

এবার আসুন চন্দ্রবোড়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ কী করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তক্ষরণ-এর লক্ষণ দেখা যাবে। ১০টি এভিএস দেওয়ার পর রক্ততঞ্চন-এর গণ্ডগোল থেকে গেল কিনা তা জানার জন্য একটি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষাটি হল ২০ ডব্লু বি সি টি; ২০ মিনিটে রক্ততঞ্চন হল কিনা দেখতে হবে।

একটি শুকনো টেস্ট টিউব বা কাচের ভায়ালে ২-৩ এম এল রক্ত (শিরা থেকে) টেনে রেখে দিতে হবে। ২০ মিনিট পর আস্তে কাত করে দেখতে

হবে রক্ত তরল আছে না জমাট বেঁধেছে। রক্ত তরল থাকার মানেই হল আরও এভিএস (১০টি) লাগবে।

দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডোজ এভিএস ৬ ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে; এজন্য ওগুলি বড়ো হাসপাতালেই দেওয়া উচিত। বড়ো হাসপাতালের মানে হল যেখানে কিডনির পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে।

প্রথম ডোজ এভিএস (১০টি) কামড়ের ১০০ মিনিটের মধ্যে দিতে পারলে কিডনির সমস্যা এড়ানো সম্ভব। কিডনির সমস্যা হলে ডায়ালিসিস দরকার হয়।

এভিএস দেওয়া হলে সেই রোগীকে ৪৮ ঘণ্টা ভর্তি রাখতে হবে, কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় কিনা দেখার জন্য। কিডনির সমস্যা হলে তা স্বাভাবিক না হলে ছুটি দেওয়া যাবে না।

একমাত্র প্রচুর ফোলা বা পচন থাকলেই অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হবে। অবশ্য-ই তা প্রথম ডোজ এভিএস (১০টি) দেওয়ার পর। এ সকল ক্ষেত্রে সার্জেন-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

২-৪ দিন ফোলা থেকে গেলে ম্যাগসালফ কমপ্রেস কাজ দেয়।

শেষ করার আগে আবারও রহস্যজনক কালাচ সাপ সম্বন্ধে সাবধান করে দিতে চাই। সব সময় খেয়াল রাখবেন প্রায়শই রোগী কোনোরকম কামড়ের কথা বলবেই না। বিচিত্র সব লক্ষণ-এর পর দুই চোখের পাতা পড়ে আসছে দেখলে অবশ্যই কালাচ কামড়ের কথা চিন্তা করবেন।

চন্দ্রবোড়া-সহ যেকোনো সাপ কামড়ের ক্ষেত্রে প্রথম ১০টি এভিএস অবশ্য-ই ১০০ মিনিটের মধ্যে দেবেন। *কোনো অবস্থাতেই ১০টি এভিএস না দিয়ে কোনো রোগীকে রেফার করা যাবে না।*

সাপ বা সন্দেহজনক কিছু কামড়ালে সময় নষ্ট না করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোতে হবে, শুধু এটুকু জানলেই বহু মানুষকে বাঁচানো সম্ভব।

এই প্রবন্ধটি শেষ করা যাক এক রোগীর রহস্যময় কালাচ সাপ কামড়ের গল্প দিয়ে। এক বছর চল্লিশের মহিলা কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সি বিভাগে আসেন ২০১৬-র জুলাই মাসের এক দুপুরে— মোটামুটি দুটোর সময়। তাঁর মূল উপসর্গ ছিল আগের দিন সকাল থেকে ঠিকমতো গিলতে পারছেন না এবং গলাতে সবসময় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তিনি আগের রাতে খোলা মেঝেতে ঘুমিয়েছিলেন। যেহেতু

সাপ বা সন্দেহজনক কিছু কামড়ালে সময় নষ্ট না করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোতে হবে, শুধু এটুকু জানলেই বহু মানুষকে বাঁচানো সম্ভব।

তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জীবনতলা গ্রাম থেকে এসেছিলেন, কালাচের কামড়ের একটা সম্ভাবনা ছিলই। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর চোখের পাতা ভারী হয়ে আধবোজা হয়ে গেছে—ডাক্তারি পরিভাষায় যাকে বলে টোসিস (ptosis)। এটা থেকে কালাচের কামড় হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেলেন। রোগীর বাড়ির লোকেরাও খুব অবাক হয়ে গেল কারণ রোগী তাদের কোনো সাপের কামড়ের কথা বলেননি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে অ্যান্টি স্নেক ভেনম চালু করা হল। রোগী পরদিন সকালেই সুস্থ হয়ে গেলেন।

সুতরাং আমি জোর দিয়ে আবার বলতে চাই সাপের কামড়ের প্রবল সম্ভাবনা আছে এরকম জায়গায়, খোলা মেঝেতে শুয়েছিলেন এরকম রোগী এলে এবং তাঁর চোখ আধবোজা বা টোসিস (ptosis)—মানে নিশ্চিত কালাচের কামড়। এই ডায়াগনোসিস এবং চিকিৎসা দেরি করলে রোগীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

"তাই বলব
'রুল অফ হান্ড্রেড' বা 'শত-র নিয়ম' মেনে চলো
জীবন বাঁচাও।" স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদার, সদস্য, জাতীয় আদর্শ চিকিৎসাবিধি দল।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

টাক পড়ার চিকিৎসা

টাক পড়ার অনেক ধরন আছে, কিন্তু যে টাক আমরা চারদিকে দেখি আর নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে আতঙ্কিত হই, সেই টাক পড়া, যার গালভারি বৈজ্ঞানিক নাম হল অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া, তাই নিয়ে লিখছেন **ডা. জয়ন্ত দাস**।

ছোটোবেলায় দাদামশাইকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি গো দাদু, তোমার মাথায় অমন টাক কেন? দাদু মুচকি হেসে বলেছিলেন টাক কোথায়, আমার কপালটা একটু চওড়া, এই যা! তাতে পাঁচ বছরের আমি ভারি আমোদ পেয়ে মামাকে গিয়ে বললাম, মামা, তোমার কপালটা তো ভারি চওড়া, হি হি হি! মামা হঠাৎ খেপে উঠে আমার গালে এক বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, বড্ড পেছনপাকা হয়েছিস দেখছি! তারপর একেবারে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, দাদু কত্‌তো ভালো, আর মামাটা কী খারাপ। দাদুর বয়স ষাট পেরিয়েছে, আর মামার বয়স পঁচিশ। দাদুর টাক চকচকে, আর মামার টাক চুলের পাতলা সী-থ্রু পর্দায় সযত্নে ঢাকা। এ দুয়ের 'চাপ' যে একেবারে আলাদা, পাঁচ বছরের আমি সেটা জানব কেমন করে?

এখন দাদু বা মামার টাক দেখে বলতাম, অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া। সব থেকে পরিচিত ধরনের টাক। চল্লিশ পেরোলেই চালশে-র মতোই প্রায় সহজপ্রাপ্য—দেখা গেছে চল্লিশ পেরোনো পুরুষ মানুষদের অর্ধেকের এরকম টাক শুরু হয়ে গেছে। চকচকে টাক কারও কারও বা অতিরিক্ত চুল পড়া। শিবরামের ভাষায়, প্রথমে চুল পড়ে, তারপর টাক পড়ে; এ-দুয়ের সীমান্তর নো-ম্যানস ল্যান্ড খুবই অস্পষ্ট। যে কথাটা মানুষ বিশেষ জানেন না সেটা হল, চল্লিশ পেরোনো মহিলাদেরও মোটামুটি অর্ধেকের এরকম টাক শুরু হয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের পুরো চকচকে টাক পড়ে খুব কমই। সামাজিক কারণে মহিলাদের চুল পড়া বেশি বড়ো সমস্যা বলে ভাবা হয়, আর সে সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে আসেন অনেকেই। আসলে পুরো সমস্যাটাই সামাজিক, তাই আমার দাদু ষাট পেরিয়ে নিজের টাক নিয়ে মজা করতে পারতেন, কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে মামা-র কাছে টাক বড়োই নির্মম অর্জন।

অবশ্য অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া ছাড়া নানা কারণে চুল পড়তে পারে—যেমন শরীরে লোহার ঘাটতি, থাইরয়েডের রোগ, মেয়েদের শরীরে 'পুরুষ হরমোন'-এর পরিমাণ বাড়া ও 'পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম', টেলোজেন এফ্লুভিয়াম, অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা, সাধারণ পুষ্টির অভাব ও কিছু কিছু ওষুধের পার্শ্বক্রিয়া। চিকিৎসক খুঁটিয়ে দেখলে সেগুলোকে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া থেকে আলাদা করে চিনতে পারেন। খুশকিতেও চুল পড়ে। এই সব রোগগুলোই আবার অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়ার সঙ্গে একসঙ্গে চুলকে আক্রমণ করতে পারে, তখন এদের আলাদা করে চিনে চিকিৎসা করতে হয়। এছাড়াও কিছু চর্মরোগে মাথার চামড়া শক্ত হয়ে যায় ও টাক পড়ে (cicatricial alopecia), চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ মাথায় হাত দিয়েই সেগুলোকে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেসিয়া-র থেকে আলাদা করতে পারেন।

অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়ার কারণে টাকের ডাক্তারি গুরুত্ব তেমন কিছু নেই। তবু তর্কের খাতিরে উল্লেখ করে রাখি, টাক-মাথায় রোদ বেশি লাগে বলে সেখানে ত্বক-ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে। আর সংখ্যাতাত্ত্বিকরা হিসেব করে দেখেছেন টেকো মানুষদের হার্ট অ্যাটাক হবার সম্ভাবনা একটু বেশি, প্রস্টেট-বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বেশি। তবে শেষ দু-রকম সম্ভাবনার সঙ্গে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়ার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, এমনটা প্রমাণ হয়নি। সুতরাং টাক পড়েছে বলে হার্ট অ্যাটাক নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে, তা নয়।

সব দেশে সব জাতির মানুষের টাক পড়ার প্রবণতা অবশ্য সমান নয়। ইউরোপের সাদা চামড়ার মানুষদের টাক বেশি পড়ে, এশিয়ার ও আফ্রিকার বাসিন্দাদের কম, এবং আমেরিকার আদি বাসিন্দা (আমরা যাদের চিনি 'রেড ইন্ডিয়ান' বলে) আর গ্রিনল্যান্ড-আইসল্যান্ডের আদি বাসিন্দা (আমরা যাদের ডাকি 'এস্কিমো' বলে) টাক পড়ে সবচেয়ে কম। কিন্তু সমস্যা হল, কোনো নির্দিষ্ট দেশেও টাক মোটেও সমদর্শী নয়। চল্লিশের আগেই তা আক্রমণ করতে পারে, আর বিশ-ত্রিশে 'ইন্দ্রলুপ্ত' হলে সে মানুষটি ভারি দুঃখ পান।

কেন টাক পড়ে?

ঠিক জানা নেই। কিন্তু টাক পড়ার প্রক্রিয়ায় কী কী ঘটে সেটা জানা আছে। মাথায় মোটামুটি এক লক্ষ হেয়ার ফলিকল (hair follicle) বা রোমকূপ আছে। প্রতিটা রোমকূপ থেকে চুল বেরোয়। তবে সবসময় ফলিকল বা রোমকূপ একই রকম কর্মক্ষম দশায় থাকে না। মাথার ১০০ টা চুলের মধ্যে গড়ে ৯০টা চুল থাকে চুল-বাড়ার দশায় (অ্যানাজেন বা গ্রোথ দশা); ১টা চুল থাকে রূপান্তর দশায় (ক্যাটাজেন দশা); আর ৯টা চুল থাকে বিশ্রাম-দশায় (টেলোজেন বা রেস্টিং দশা)। চুল-বাড়ার দশার স্থায়িত্ব মোটামুটি ১০০০ দিন, রূপান্তর দশার স্থায়িত্ব ২০ দিন, আর বিশ্রাম-দশার

স্থায়িত্ব ১০০ দিন। বিশ্রাম-দশার পরে পুরোনো চুলটি রোমকূপ থেকে ঝরে যায়, আর তার দুই সপ্তাহ পরে সেই রোমকূপ থেকে নতুন চুল বেরোয়। এই চুল ঝরে যাওয়াটা স্বাভাবিক, সেটা না হলে নতুন চুল গজানোর মতো রোমকূপ থাকত না। যত চুল ঝরে, মোটামুটি তত চুল যতদিন গজাচ্ছে, ততদিন চিন্তার কিছু নেই, চুল পড়বে কিন্তু কমবে না। দিনে মোটামুটি ১০০টা চুল পড়লে, চিন্তার কিছু নেই। সমস্যা হয় তখনই যখন চুল-বাড়ার দশা (অ্যানাজেন) চলে কম সময় ধরে, আর রূপান্তর দশা (ক্যাটাজেন) ও বিশ্রাম-দশা (টেলোজেন) চলে একই সময় ধরে। এতে চুল প্রথমে সরু ও ছোটো হয়ে যায় (miniaturization-মিনিয়েচারাই-জেশন)। কিন্তু এমনটা ঠিক কেন হয় তার নিশ্চিত উত্তর নেই, যদিও এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা আছে। কিন্তু কেবলমাত্র 'মিনিয়েচারাইজেশন' অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেসিয়া-র পুরো ব্যাখ্যা নয়।

চিত্র ১. মেয়েদের টাক পড়লে সামাজিক সমস্যা বেশি

অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া চিনবেন কীভাবে?

কীভাবে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া-কে অন্য নানা ধরনের চুল পড়া থেকে আলাদা করা যাবে? কোনো নির্দিষ্ট রক্ত পরীক্ষা বা ওই ধরনের কিছু পরীক্ষা নেই। মূলত রোগীর কাছ থেকে চুল পড়ার ধরন সম্পর্কে ইতিহাস নিয়ে, ও রোগীকে ভালো করে দেখে বলা হয় অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া হয়েছে। অন্য রোগ আছে কি না সেটা জানার জন্য কিছু অল্প পরীক্ষার দরকার হতে পারে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে।

অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়ায় ছেলেদের চুল পড়া শুরু হয় কপালের দু-পাশ থেকে, ও তারপর মাথার একদম ওপরের দিকের চুল পাতলা হয়ে যায়। মেয়েদের সাধারণত মাথার ওপরের চুল পড়া দিয়েই এটা শুরু হয়। ছেলেদের কপালের দু-পাশ ও মাথার ওপরে টাক পড়ে। অনেকটা টাক পড়ে গেলেও কানের ওপরে ও মাথার পেছনদিকে কিছু চুল শেষ অব্দি বজায় থাকে। এরকম সুনির্দিষ্ট ধরনে চুল পড়লে বুঝতে হবে ওটা অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া। মেয়েদের সাধারণত মাথার ওপরের চুল পড়া দিয়েই এটা শুরু হয়। মেয়েদের পুরো টাক কমই পড়ে, কিন্তু যদি পুরো টাক পড়েই যায় তবে তা পড়ে মাথার ওপর ও সামনের দিকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে অবশ্য একে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া না বলে 'ফিমেল প্যাটার্ন হেয়ার লস' বলাটাই বেশি চালু। আর ছেলেদের টাক পড়াকেও 'মেল প্যাটার্ন হেয়ার লস' বলা হয়।

যদিও অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া রোগটা ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা সম্ভব, কিন্তু আরও কিছু রোগের জন্য চুল পড়তে পারে, আর প্রথম দিকে সেগুলোকে আলাদা করে চেনা শক্ত। সেই রোগগুলোর প্রধান হল:

১. শরীরে লোহার ঘাটতি, যেটা চেনার জন্য রক্তে হিমোগ্লোবিন, ফেরিটিন, ট্র্যান্সফেরিন এসব মাপতে হয়।

২. থাইরয়েডের রোগ, যেটা চেনার জন্য রক্তে টিএসএইচ মাপতে হয়।

৩. মেয়েদের যদি চুল পরার সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ-দাঁড়ির আভাস বা দেহে ছেলেদের মতো বড়ো মোটা লোম দেখা যায়, তাহলে কিছু রক্ত পরীক্ষা করে 'পুরুষ হরমোন'-এর পরিমাণ বেড়েছে কিনা সেটা দেখতে হয়। এছাড়া 'পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম' সন্দেহ করা হলে তার উপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে [*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র ডিসেম্বর ২০১৬-জানুয়ারি ২০১৭ সংখ্যায় ডা. কাঞ্চন মুখার্জির 'পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

৪. টেলোজেন এফ্লুভিয়াম ও অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটা—এদের অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া-র থেকে আলাদা করা শক্ত হতে পারে। এগুলো চেনার জন্য ডাক্তারের সযত্ন ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার বিকল্প নেই।

৫. কিছু কিছু ওষুধ খেলে চুল পড়তে পারে। তার বিস্তৃত তালিকা এখানে দেবার দরকার নেই। চিকিৎসককে তাই রোগী কী কী ওষুধ খাচ্ছেন সেটা জানতে হবে।

৬. সাধারণ পুষ্টির অভাবে, বিশেষ করে লোহার অভাবে, চুল পড়ে। চিকিৎসককে রোগীর অপুষ্টির সম্ভাবনা ও লক্ষণ দেখতে হয়, ও সেইমতো ব্যবস্থা করতে হয়।

৭. এছাড়া কিছু চর্মরোগে মাথার চামড়া শক্ত হয়ে যায় ও টাক পড়ে (cicatricial alopecia)। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ মাথায় হাত দিয়েই সাধারণত সেগুলোকে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া-র থেকে আলাদা করে চিনতে পারেন, কিন্তু একেবারে প্রথম পর্যায়ে কখনো-সখনো ভুল হতেও পারে।

অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া-র চিকিৎসা

রোগীকে তাঁর রোগের প্রকৃতি বোঝানো দরকার। এই রোগ সারিয়ে দেবার মতো কোনো ওষুধ বা পদ্ধতি নেই, সুতরাং চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে, উন্নতি হলেই তা বন্ধ করে দেওয়া চলবে না, সেটা রোগী না বুঝলে চলবে না।

অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া থাকলেও, চুল পড়ার আরও কিছু কারণ থাকতে পারে, যেমন খুশকি। খুশকি থাকলে তার চিকিৎসা করা দরকার। মূলত কিটোকোনাজোল, জেডপিটিও ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খুশকির

শ্যাম্পু খুশকিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, ও খুশকির জন্য চুল পড়া ঠিক হতে পারে, কিন্তু কোনো ওষুধেই খুশকি পুরো সেরে যাবে, এমন বলা যায় না।

চুল পড়া নিয়ে মানুষের মনে এমনিতেই প্রচুর ভুল ধারণা আছে, তার ওপর নানা স্বঘোষিত 'সৌন্দর্য-বিশেষজ্ঞ' খবরের কাগজ, টেলিভিশন-ইন্টারনেটে হরবখত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অপবিজ্ঞান প্রচার করে চলেছেন। অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়া নিয়ে এরকম কিছু ভুল ধারণা হল—বিশেষ বাণিজ্যিক তেল বা শ্যাম্পু মাখলে চুল পড়া বন্ধ হয়, কিছু বিশেষ 'ভিটামিন'-এর অভাবে টাক পড়ে, কিছু নির্দিষ্ট জিনিস খেয়ে টাক আটকানো যায়, টাকের একমাত্র চিকিৎসা হল 'হেয়ার ট্র্যান্সপ্লান্ট' বা অপারেশন করে মাথার একদিকের চুল অন্যখানে বসিয়ে দেওয়া। এসব ফালতু জিনিসের পেছনে না ছুটে রোগীর দরকার পুষ্টিকর সাধারণ খাদ্য, তাঁর চুলের পক্ষে উপযুক্ত জিনিস মাখা (যেমন তেলতেলে মাথা ও খুশকি থাকলে তেল না লাগানো ও নিয়মিত শ্যাম্পু করা)। খুশকি ইত্যাদি থাকলে চুল পড়া বাড়ে, আর এসব ব্যাপার চট করে সারেও না, তাই সেগুলোর নিয়মিত চিকিৎসা চালাতে হবে। 'হেয়ার ট্র্যান্সপ্লান্ট' অবশ্য ফালতু জিনিস নয়, কিন্তু সেটা হল টাক পড়া অনেক এগিয়ে গেলে শেষ পর্যায়ের চিকিৎসা, এবং অত্যন্ত খরচের চিকিৎসাও বটে। প্রথমেই 'হেয়ার ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট' করার প্রচেষ্টা কেবলমাত্র বাণিজ্যিক কারণেই করা হয়।

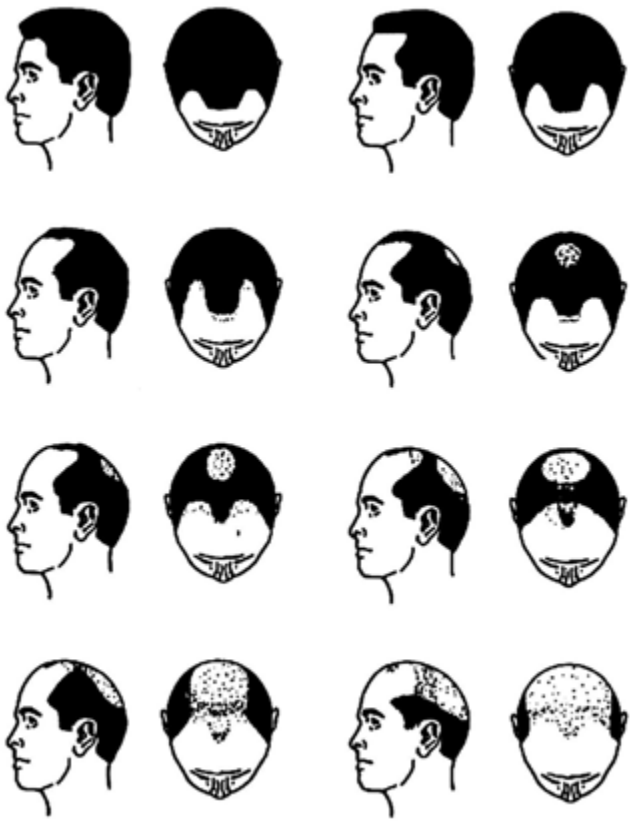

চিত্র ২. পুরুষদের টাক পড়ার নানা পর্যায়

অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেসিয়ায় ছেলেদের জন্য মাথায় মাখার মিনোক্সিডিল (২% বা ৫%, ডাক্তারের পরামর্শমাফিক) ও মুখে খাবার ফিনাস্টেরাইড ১ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট প্রমাণিত ওষুধ। মেয়েদের জন্য মাথায় মাখার মিনোক্সিডিল(২%) হল প্রমাণিত ওষুধ, আর তার সঙ্গে যদি হরমোনঘটিত কোনো সমস্যা পাওয়া যায় তো তার চিকিৎসা। এছাড়া অন্য নানা ওষুধ নিয়ে গবেষণা চলছে, আরও কিছু কিছু ওষুধ কম-বেশি কার্যকর প্রমাণিতও হয়েছে, কিন্তু মিনোক্সিডিল ও ফিনাস্টেরাইড এ-দুটোই সবথেকে প্রমাণিত ওষুধ। এগুলোতে অসুবিধা হলে বা কাজ না হলে তবে অন্য ওষুধ দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

মিনোক্সিডিল মেখে উন্নতি কিন্তু ওষুধ চালিয়ে যাবার ওপর নির্ভরশীল। উন্নতি হবার পর মিনোক্সিডিল মাখা বন্ধ করলে চার থেকে ছয় মাসের মধ্যে চুল পড়ে গিয়ে ওষুধ মাখার সমস্ত সুবিধা লোপ পায়। আর একটা জরুরি কথা হল, মিনোক্সিডিল মাখা শুরু করার পরে পরেই বেশ কিছু চুল পড়তে পারে, তাতে অনেকে ভয় পেয়ে ওষুধটা মাখা বন্ধই করে দেন। আসলে 'টেলোজেন' দশায় থাকা চুলগুলোকে মিনোক্সিডিল ঝরিয়ে দেয়—এতে আখেরে নতুন চুল গজাতে সুবিধাই হয়। এই ব্যাপারটা রোগীকে বুঝিয়ে বলা দরকার। এছাড়া ফিনাস্টেরাইড ট্যাবলেট খাবার পর যৌন চাহিদা সাময়িকভাবে কমা বা ওই ধরনের কিছু সমস্যা হতে পারে, সেটা ওষুধ চলতে চলতে নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়; তা না হলে কিছুদিন দেখে ওষুধটি বন্ধ করতে হয়। এজন্য স্থায়ী যৌন সমস্যা হয় না। তবু, বীর্যপরীক্ষা করে যাদের শুক্রাণু-সংখ্যা কম পাওয়া যায়, বা সাময়িক সন্তানধারণে সমস্যার ইতিহাস থাকে, এমন পুরুষমানুষ যদি সদ্যবিবাহিত হন, বা সন্তান চান, সে ক্ষেত্রে ফিনাস্টেরাইড না দেওয়াই উচিত।

'হেয়ার ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট' হল অনেকটা টাক পড়ে যাবার পর কার্যকর কিন্তু খুব খরচের চিকিৎসা। দেখা গেছে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেসিয়া অনেক এগিয়ে গেলেও মাথার পেছন দিকের চুল পড়ে যায় না। সেখানকার চুল অপারেশন করে তুলে এনে টাকের মধ্যে বসানো হয়। এই নতুন বসানো চুলের যথাযথ পরিচর্যা হলে তা অনেকদিন থাকে। আজকাল হেয়ার ট্র্যান্সপ্লান্ট পদ্ধতির অনেক রকমফের করে অনেকটা উন্নতি ঘটানো হয়েছে।

টাক ঢাকার অনেক অ-ডাক্তারি পদ্ধতি আছে, সেগুলো অনেকের কাজে লাগে। নানা ধরনের পরচুলা, মাথার ফাঁকা জায়গায় কালো রং করা, এমন কী লম্বা চুল রেখে তাই দিয়ে টাক ঢাকা—এগুলো তেমন ফেলনা ব্যাপার নয়।

অকালে চুল পড়া কোনো বড়ো রোগ নয়, কিন্তু এর স্থায়ী, সহজ ও সবার জন্য কাজের সমাধান আজও অধরা। ফলে কিছু কিছু রোগী টাক পড়লে ডাক্তারি সমাধানে আস্থা না রেখে সব কিছুই করতে শুরু করেন। কেউ বা মানত করেন, কেউ হোমিওপ্যাথি, আর কেউ নানা টোটকা। তাঁদের সমস্যাটাকে উড়িয়ে না দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও তার সীমা দুটোই বোঝানো দরকার, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে 'হেয়ার ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট' ইত্যাদির অতি-ব্যবহার সম্পর্কে এইসব রোগীকে সতর্ক করাও দরকার। সবার টাকের দুঃখের সমাধান হবে না ঠিকই, কিন্তু অনর্থক শ্রম ও অর্থব্যয় থেকে রোগীদের মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করাটা ডাক্তারদের অবশ্য-কর্তব্য। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

জয়ন্ত দাস, এমবিবিএস, এমডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

একালের নার্সিসাস ও সেল্‌ফি

পথ চলতে চলতে আজকাল হামেশাই দেখা যায় বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, বিচিত্র মুখ ভঙ্গিমা (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃত্রিম হাসি) করে তরুণ বা তরুণী স্মার্ট ফোনে সেল্‌ফি নিচ্ছে। কখনো-বা সমবেত গ্রুপফি। আমরা যারা সত্তর বা আশির দশকে পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছি, সেই আমাদের চোখে এই আচরণ বিস্ময় জাগায়। মনে পড়ে যায় গ্রিক উপকথার নার্সিসাসকে। আত্মমগ্ন এক যুবক যে কিনা জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেরই প্রেমে পড়েছিল ও সেই আত্মমগ্ন প্রেমের পরিণতি হল মৃত্যু। একালের নার্সিসাসের জন্য কী অপেক্ষা করছে? লিখেছেন **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

একালের নার্সিসাস

নার্সিসাসের উপকথার জন্ম হয়তো খ্রিস্টের জন্মেরও হাজার বছর আগে (1000 BC)। তারপর মানুষ সভ্য থেকে সভ্যতর হয়েছে। বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানুষ অজানাকে জেনেছে। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে শিখে নার্সিসাসকে গ্রিক উপকথার নায়ক থেকে অন্তর্লীন মানসিক জটিলতা রূপে বর্ণনা করেছে।

যিশু হে!

কিন্তু আজ, এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে পথে ঘাটে লক্ষ লক্ষ প্রযুক্তি-নির্ভর নার্সিসাসকে কি দেখছি না আমরা? একদল নিজের সত্তায় নিজে বিভোর 'সেলফি'-প্রেমী উন্মত্ত জনগোষ্ঠী যারা সর্বত্র, সবরকম পরিস্থিতিতেই আগে একটা সেলফি নিতে উদ্যত হচ্ছে। সেই একালের নার্সিসাসদের নিয়েই এবারের লেখা।

মুঠোফোনের আবির্ভাব—এক অভিনব বিপ্লব

১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই তদানীন্তন টেলিকম মন্ত্রী শ্রী সুখরাম এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ভারতবর্ষে প্রথম মোবাইল ফোন কলে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন। সেই শুরু। তারপর থেকে ভারতবর্ষে সংযোগস্থাপনের এক নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। আর সেই প্রযুক্তির হাত ধরে লম্বা পথ হাঁটতে শুরু করেছে এক অভিনব সামাজিক বিপ্লব। বিশ বছরের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মুঠোফোন আজ স্মার্ট হয়েছে। এই একরত্তি স্মার্ট ফোন ব্যক্তির সমাজ জীবনে এনেছে আমূল পরিবর্তন। সামাজিক জীবনে যোগাযোগের ভিত্তি এখন প্রধানত এই স্মার্টফোন। সেখানে কী নেই? ইন্টারনেট নামক তরঙ্গটি হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে একটা "ভার্চুয়াল" সমাজ। সেখানে হাসি-কান্না আছে, তরজা-লড়াই আছে, অযাচিত স্নেহ- ভালোবাসা আছে। মানে, আছে কতটা জানা নেই তবে বিপুল প্রকাশ আছে। হ্যাঁ, প্রকাশিত হতে চায় মানুষ। মনের মতো করে সকলের সামনে নিজেকে পেশ করার সাধ থাকে কম বেশি সবার মধ্যে। আর সে সুযোগ যদি হাতের মুঠোয় থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা। তাই মানুষ পা বাড়িয়ে দিল এই নতুন সমাজে। ব্যস্ততার মধ্যেও ক্রমাগত খণ্ডিত হল তার চেতনা—এমনকী ব্যক্তিত্বও। তার বাস্তব সত্তা স্বপ্নের সত্তার কাছে হার মানল এবার। যা নয়, কিন্তু যা হতে চায় সেই মুখোশ পরে এই নতুন সমাজে আনাগোনা শুরু হল তার। এই প্রকাশ করার তাগিদেই মুঠোফোন স্মার্টফোন আর তাতে এল ফ্রন্ট ক্যামেরা। সমস্ত পরিস্থিতিতেই ক্যামেরা বন্দি বিচিত্র সব মুখভঙ্গিমার ছবি—সেল্‌ফি। পার্কে, শ্মশানে, খেলার মাঠে, বাজারে, শপিংমলে, দুর্ঘটনাস্থলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল বিচিত্র মুখভঙ্গিমার কৃত্রিম আবেগ। একটি সেল্‌ফি আর সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট। কী পাওয়া গেল তাতে? লাইক আর কমেন্ট। ক-টা লাইক পড়লটাই জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। চিঠি লেখা উঠেই গেল মানুষের জীবন থেকে।

> যা নয়, কিন্তু যা হতে চায় সেই মুখোশ পরে এই নতুন সমাজে আনাগোনা শুরু হল তার।

শিশুর জীবনেও এসেছে পরিবর্তন। এখন খেলা বলতে তার জীবনে অনেকটাই জুড়ে আছে মুঠোফোনে গেম, খেলা। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় যে ফুটবল, ক্রিকেট সবই খেলছে, শুধু সত্যিকারের মাঠের সবুজ ঘাসের ছোঁয়া লাগে না তার পায়ে। লাগে না কাদা জল। বন্ধুর সংখ্যা কমছে তার জীবনে। মোদ্দা কথা হল, মানুষ বাস্তব জগতের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল এক ভার্চুয়াল জগতেরও বাসিন্দা হয়ে পড়ল। বাড়ির কোনো অনুষ্ঠান, স্বামী-স্ত্রী-র পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ, সন্তানের কোনো বিশেষ কৃতিত্ব, সব কিছুই ভাগ করে নেওয়া এই ভার্চুয়াল দুনিয়ার সঙ্গে। এছাড়া আছে কোথাও যাতায়াতের খবর, বড়ো রেস্টুরেন্টে খাওয়ার খবর, মন খারাপের খবর, মন ভালো হওয়ার খবর, সকালের ব্রেকফাস্ট, দুপুরের লাঞ্চ, জন্মদিনের কেক সবকিছুই নিবেদিত ও গৃহীত হয় এ দুনিয়ায়—ছবির মাধ্যমে। সংযোগস্থাপনের বিভিন্ন মাধ্যমগুলিকে ছাপিয়ে জনচেতনার অনেকখানি দখল করে ফেলেছে মুঠোফোন। সেই অর্থে এ এক অভিনব বিপ্লব বই কী।

নার্সিসিসটিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual-5)-এ নার্সিসিসটিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারের যে

প্রধান শর্তাবলি (Criteria) নির্ধারণ করেছেন সেগুলি হল—

১. নিজের সম্বন্ধে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার বোধ।
২. প্রয়োজনীয় সফলতা অর্জন না করেও তার কৃতিত্বের জন্য অন্যের প্রশংসা লাভের ইচ্ছা।
৩. নিজের কৃতিত্বকে বাড়িয়ে প্রকাশ করা।
৪. সফলতা, ক্ষমতা, রূপ, যথার্থ সঙ্গী ইত্যাদির সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকা।
৫. সবসময়ে অন্যের প্রশংসা ও আলোচনার প্রত্যাশী হয়ে থাকা।
৬. অন্যের প্রয়োজন ও অনুভূতি বোঝার অক্ষমতা।
৭. যা চাই তা পাওয়ার জন্য অন্য মানুষকে ব্যবহার করা।
৮. আচরণের মধ্যে একটা ঔদ্ধত্য।

সেল্‌ফি নেওয়ার অভ্যাস কি নার্সিসিসটিক আচরণ?

আগেই বলা হয়েছে ইন্টারনেটের প্রচলন ব্যক্তির সামাজিক জীবনে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। গোটা বিশ্ব এখন তার মুঠোয়, মুঠোফোনের দৌলতে। স্মার্টফোনে সেল্‌ফি নেওয়ার অভ্যাস সব বয়সের মানুষের মধ্যে অল্প বিস্তর দেখা দিলেও এই আচরণ সব থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে তরুণ প্রজন্মের ওপর। কেন এই সেল্‌ফি? জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ক্যামেরা বন্দি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পিছনে কোন প্রেষণা (motivation) কাজ করছে সেটা একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

১. নিজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা।
২. অন্যের প্রশংসালাভের ইচ্ছা।
৩. অনেক ক্ষেত্রেই নিজের কৃতিত্বকে বাড়িয়ে প্রকাশ করা।
৪. সফলতা, ক্ষমতা, রূপ, সঙ্গী ইত্যাদির সম্বন্ধে দিবাস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকা।

এই ধরনের প্রেষণাগুলির ওপর নজর চালালে দেখা যাবে, এর সব ক-টিই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বাস্তবের সংস্পর্শ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। যা নয়, তাই অন্যের কাছে প্রমাণ করার তাগিদ তার নিজের সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা গড়ে তোলার পরিপন্থী। এর ফল কখনোই ভালো হতে পারে না। নিজেকে নিয়েই সে ক্রমাগত বিভোর হয়ে পড়তে পারে ফলে অন্যের অনুভূতি ও প্রয়োজন তার কাছে গুরুত্ব হারায়।

বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নতার পরিমাণ যদি বাড়তে থাকে তার পরিণতি মানসিক ভারসাম্যহীনতা।

তবে কি ঘন ঘন সেল্‌ফি নেওয়ার অভ্যাস মানসিক রোগ?

ইন্টারনেটে গুগুল সার্চ ইঞ্জিন ঘাঁটলে দেখা যাচ্ছে আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন (APA) নাকি এই আচরণকে সেলফাইটিস (selfitis) আখ্যা দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন এটা এক বিশেষ ধরনের অবসেসিভ কমপাল্‌সিভ ডিজঅর্ডার। যদিও আমেরিকার সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ই-মেলের মাধ্যমে এর সত্যতা জানতে চাইলে তাঁরা পুরোপুরি নাকচ করে দেন বিষয়টা। 'সেলফি' নিলেই যেকোনো মানুষকে মানসিক রোগী মনে করতে হবে এমনটা বলার কোনো যুক্তি সত্যিই নেই। কিন্তু যদি এই ধরনের আচরণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং সেল্‌ফি নিতে না পারলে যদি মানসিক অবসাদ, উদ্বেগ, রাগ বিরক্তি ইত্যাদির অনুভূতি বাড়তে থাকে, অন্য বিষয়ে আগ্রহের অভাব দেখা যায়,

সেলফি (শ)!

স্কুল বা কাজের জায়গায় যথার্থ মনোযোগ দিতে না পারা ও মনঃসংযোগে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। কারণ, এগুলি মানসিক অসুস্থতার নির্ধারক হিসাবে গণ্য হয়।

সেল্‌ফি নিতে না পারলে যদি মানসিক অবসাদ, উদ্বেগ, রাগ বিরক্তি ইত্যাদির অনুভূতি বাড়তে থাকে . . . তাহলে অবশ্যই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা মনোবিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

Ralph Keyes লিখেছেন—'At one time we had truth & lies. Now we have truth, lies and statements that may not be true but we consider to benign to call false. The term deceive gives way to spin . . .' মিথ্যার এই নবসজ্জা—এই ধারণা আজ আমাদের সমাজের সর্বস্তরে লক্ষণীয়। এই সত্য-পরবর্তী (post truth) যুগে মিথ্যার (যা অনেকটাই নৈতিক অবনতি হিসাবে গণ্য) এক নতুন পরিচয় আরোপ করা হয়েছে—বলা যায়, সত্যকে অস্বীকার করা (Denial)। এ যেন মুখোশের আড়ালে সত্যকে লুকিয়ে রাখা। মিথ্যার গায়ে চকচকে একটা মোড়ক লাগানো—absence of truth। সারা পৃথিবীতে চলছে এই পোস্ট ট্রুথ এরা-র (post truth era) দাপট। এই অসত্য (মেকি) (deception) ব্যবহারের পিছনে কাজ করছে কোন প্রেষণা। নতুন মোড়কের এই মিথ্যাচার ব্যক্তিকে দিচ্ছে স্বীকৃতি। একটু অতিরঞ্জন ব্যক্তিকে নিজের জীবনের পরিস্থিতিগুলোকে অনেক মনোমত করে উপস্থাপনার সুযোগ দিচ্ছে। তাতে ক্ষতি কিছু নেই। ইন্টারনেটের আমদানি, সেল্‌ফি নেওয়ার সুযোগ তাতে অনায়াসে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে। মানুষের মধ্যে বেড়ে চলেছে নার্সিসিসটিক মনোভাব। আজকের দিনে সত্য-মিথ্যার বিভাজন আপেক্ষিকতার তুলাদণ্ডে বিচার্য। তার ফল কী? বিশ্বাসের নড়ে যাওয়া ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজ। কল্পজগতে ডুবে থাকা তরুণ সমাজ এই অসত্যের হাতছানি কাটিয়ে উঠলে, প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ সুস্থ বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানব ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারে। আশাবাদী আমরা। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

সীমান্ত জীবন

পর্ব-১

বেশ কিছুদিন আগে উত্তর চব্বিশ পরগনার স্বরূপনগর এলাকায় MASUM (বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক মেডিক্যাল ক্যাম্পে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তারই একটি তুলে ধরেছেন **ডা. মৃন্ময়**।

মনিরুল গাজী (নাম পরিবর্তিত) তাঁর ছেলে, বউ ও বাবার সঙ্গে এসেছেন ডাক্তার দেখাতে। বয়স ২৭ বছর। পুরো পরিবারের সঙ্গেই কম বেশি কথা হল। প্রথমে মনিরুল, তারপর তাঁর বউ ও তারপর মনিরুলের বাবার সঙ্গে।

প্র: আচ্ছা তুমি কী করো?

উ: আমি এখন কিছু করতে পারি না ডাক্তারবাবু। আগে চাষ করতাম।

প্র: তোমার বাড়ি কোথায়?

উ: আমার বাড়ি সীমান্তের কাছে, ভারত আর বাংলাদেশের বর্ডার থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে।

প্র: তা এখানের এই MASUM-এর সঙ্গে যোগাযোগ হল কীভাবে?

উ: বাবা নিয়ে এসেছে, আমি জানি না।

প্র: তোমার কী শারীরিক অসুবিধা হয় যার জন্য ডাক্তার দেখাতে এসেছ?

উ: ডাক্তারবাবু আমাকে জওয়ান ছররা গুলি মারে। সারা মুখে, পিঠে, ঘাড়ে এখনও অনেকগুলো ছররার টুকরো আছে দেখুন। এই এগুলো খুব যন্ত্রণা করে। ডান চোখে একদম দেখতে পাই না, বাম চোখেও ঝাপসা দেখি। জানেন তো ডাক্তারবাবু এত যন্ত্রণা হয় যে মনে হয় এর থেকে যদি গুলি করে মেরে ফেলত তাহলে অনেক ভালো হত।

আমাকে জওয়ান ছররা গুলি মারে। সারা মুখে, পিঠে, ঘাড়ে . . . ডান চোখে একদম দেখতে পাই না, বাম চোখেও ঝাপসা দেখি।

প্র: কেন তোমাকে মারল?

উ: তা ডাক্তারবাবু সে অনেক গল্প।

প্র: আরে বলোই না কী হয়েছিল ঘটনা?

উ: প্রায় দেড় বছর আগের কথা। একদিন বিকেলে এক বন্ধুর জমিতে চাষের জন্য আগাছা তুলে ফেলছিলাম আমি আর ইয়াজুল নামে আর এক জন। আসলে এখানে চাষ করার জন্য জনমজুর পাওয়া যায় না, ভয়ে কেউ আসতে চায় না, তাই আমরা একে অপরের জমিতে মজুরের কাজ করি। জমিটা পুরো বর্ডারের কাছাকাছি। তখন বিকেল ৬টার মতো হবে। হঠাৎ চেঁচামেচির আওয়াজে উঠে দেখতে যাই। ৬ জন মতো লোক ভারত থেকে বাংলাদেশে গোরু পাচার করছিল। তাদের সঙ্গে BSF-এর গণ্ডগোল হয়। খিস্তি মারামারি চলতে থাকে। হঠাৎ করে আমাকে দেখে একজন জওয়ান বলে 'এই বানচোদ এদিকে দেখছিস কেন রে?' আমি ঘুরে আবার কাজে যাব এমন সময় আমাকে ছররা বন্দুক দিয়ে গুলি করে। তারপর আমি আর কিছু জানি না, আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখি কলকাতার হাসপাতালে।

প্র: আচ্ছা তুমি কোনোদিন এসব পাচার-টাচার করেছ নাকি?

উ: সত্যি কথা বলতে ডাক্তারবাবু ৩-৪ বছর আগে করেছি কয়েকবার। আমার ভাই এই কাজ করত। বারিক লাইন জানেন তো ডাক্তারবাবু?

প্র: সে আবার কী?

উ: সে পাচার ব্যাবসা। গোরু পাচার হত ভারত থেকে বাংলাদেশে। এখন বন্ধ হয়ে গেছে। মালিক-এর পদবি ছিল বারিক, সেই থেকে বারিক লাইন। মানে বড়ো মাপের পাচার ব্যবসায়ী। মানিক-এর সঙ্গে BSF-এর জওয়ানদের বোঝাপড়া ছিল। জওয়ানরা বারিকবাবুর গোরু হলে গোরু প্রতি প্রায় ১০০০ টাকা নিয়ে পাশ করিয়ে দিত, কিছু বলত না। অনেকে কাজ করত। তা বন্ধ হয়ে গেছে।

প্র: কেন বন্ধ হল?

উ: জানি না ডাক্তারবাবু।

প্র: এখন হয় এসব?

উ: জানি না, এখন তো বাড়ি থেকে একা বেরোতেও পারি না—পুরো ঝাপসা।

প্র: আচ্ছা তুমি বাকি ছররার টুকরোগুলো বের করছ না কেন?

উ: ডাক্তারবাবু টাকা কোথায় পাব? নাহলে এমন যন্ত্রণা সহ্য করে পড়ে থাকি?

প্র: তোমাকে যে কোনো কারণ ছাড়াই গুলি করল, তোমরা কোনো অভিযোগ বা ঝামেলা করনি?

উ: বাবা থানায় গেছিল। আমি কেস-এর ব্যাপারে কিছুই জানি না, বাবা দেখাশোনা করে। কেস করা হয়েছিল বোধহয়। আর ঝামেলা কে করবে ডাক্তারবাবু, বেশিরভাগই জন-মজুর ও চাষ করে খাই। জমি সেই বর্ডারের একদম পাশে। কিছু বললে তো একা পেলেই মারবে। তাই ভয়ে কেউ ঝামেলা করে না।

প্র: তুমি সরকারি হাসপাতালে বা অন্য ডাক্তারকে দেখাও না কেন?

উ: সরকারি হাসপাতাল বলতে ডাকবাংলো হাসপাতাল। কয়েক বার গেছি—দেখার আগেই ওষুধ লিখে দেয়, আর ব্যথাও কমে না। আর প্রাইভেট ডাক্তার তেমন নেই। কিছু কোয়াক আছে, ৫০ টাকা করে ভিজিট নেয়। এত টাকা পাব কোথা থেকে?

প্র: এটা তোমার ছেলে?

উ: হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, ক্লাস ফোর-এ পড়ে।

প্র: ছেলেকে পড়াবে তো?

উ: ডাক্তারবাবু ওই মাধ্যমিক পর্যন্ত বড়োজোর পড়াতে পারব। টাকা পাব কোথা থেকে পড়ানোর? মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুলে যেটুকু পড়ে পড়বে। তারপর কাজ করতে পাঠাব কিছু একটা, নাহলে ও নিজে খাবে কী করে? আমাদের কথা ছাড়ুন।

হাসপাতালে বিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার-এ পৌঁছায় ৫ দিনে। জমি বিক্রি করে দিতে হয়েছে

প্র: মনিরুলের বউ-এর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি গুলি খাওয়ার পর ইয়াজুল মনিরুলকে কাঁধে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। এখন সংসার চালানোর জন্য মনিরুলের বউ মাঠে কাজ করে। মনিরুলের বউ জানায় মাঠে মেয়েরা কাজ করলে জওয়ানদের চোখগুলো কেমন নোংরা দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে ঘোরাফেরা করে, বিভিন্ন অশ্রাব্য গালিগালাজ কীভাবে শুনতে হয়।

মনিরুলের বাবার কাছ থেকে জানতে পারি গুলি লাগার পর কোনো ডাক্তার দেখতে চায়নি মনিরুলকে। তারপর ডাকবাংলো হাসপাতালে মনিরুলকে নিয়ে যাওয়া হয়। গা থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। সেখানে চিকিৎসার জন্য গায়ে হাত দেওয়া তো দূরস্থান, চলে ডাকবাংলো থেকে বসিরহাট, বসিরহাট থেকে কলকাতা, রেফার রেফার খেলা। অবশেষে কলকাতায় এলে হাসপাতালে জানায় এটি যেহেতু জওয়ান-এর গুলির ঘটনা তাই এর আইনি দিক না ঠিকঠাক হলে চিকিৎসা সম্ভব নয়। সেই ঝঞ্ঝাট কাটাতে হাসপাতালের পুলিশ, সুপার, ডাক্তার ঘুরে ঘুরেও সমাধান মেলেনি পরের দিন সকাল পর্যন্ত। এদিকে রক্তক্ষরণ হয়ে অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে। তাই আর কোনো উপায় না দেখে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় সকাল ১০টায়। রক্ত দিতে হয়। কয়েকটা ছররার টুকরো বের করে সেখানে, কিন্তু হাসপাতালে বিল ১ লক্ষ ৯০ হাজার-এ পৌঁছায় ৫ দিনে। জমি বিক্রি করে দিতে হয়েছে যা ছিল। আর পারেনি মনিরুলের বাবা। কবে বাকি চিকিৎসা হবে কেউ জানে না।

লোকগুলিকে সিনেমা হলে সিনেমা দেখার আগে দাঁড়িয়ে ‘জনগণমনঅধি’ . . . গাইতে বলা যায়।

ভাবতে থাকি আমাদের জীবন আর এদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ের কথা। আকাশ-পাতাল তফাত। ভাবুন এই লোকগুলিকে সিনেমা হলে সিনেমা দেখার আগে দাঁড়িয়ে ‘জনগণমনঅধি’ . . . গাইতে বলা যায়। ভাবুন আগামী ১৫ আগস্ট আমি-আপনি ছুটি কাটাব। লালকেল্লায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুনব। পতাকা উত্তোলন হবে। ভারত মাতার জয়, জয় হিন্দ্ স্লোগানে দেশ ভরে উঠবে আর মনিরুল রোজের মতো বিছানায় শুয়ে ছটফট করবে যন্ত্রণায়। মনিরুলের বাবা ভাববে কীভাবে ছেলের জন্য এই পর্বতসমান টাকা জোগাড় হবে। মনিরুলের বউ মাঠে কাজ করতে গিয়ে দেশরক্ষকদের কত গালাগাল শুনবে। কত জোড়া সীমান্তরক্ষীর চোখ মনিরুলের বউ-এর দিকে ধর্ষকের দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে।

চিকিৎসক হিসেবে আমরা সব রোগীকে সমান দৃষ্টিতে দেখব—এমন একটা প্রতিজ্ঞা করতে হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে চিকিৎসা দেবার চেষ্টা করব—শপথ করতে হয়। কিন্তু মনিরুলকে আমাদের চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান, তার চিকিৎসকরা ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

আপনারাই বলুন, স্বদেশের অদৃশ্য সীমানাটা কি মনিরুলের বাড়ি-জমিকে কোনোভাবে বাইরে ঠেলে দিয়েছে? ডাক্তারির আর মানবতার সীমানার বাইরে? স্বাস্থ্যের বৃত্ত

ডা. মৃন্ময়, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষদের জন্য তৈরি এক ক্লিনিকের চিকিৎসক।

গল্প

রক্তবীজ

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত

॥১॥

বেগুন ক্ষেতে আগুন জ্বলে

হাসিবুল সর্দারের পেটটা সন্ধ্যে থেকেই ছেড়েছে। গত দু-দিন খালাতো ভাই-এর নিকায় ভীমের আহার করেছিল। দু-বেলাই চলেছে খ্যাটনপর্ব। লুচি, ভাত, ডাল, ছ্যাঁচড়া, মাংস, দই, রসগোল্লা। পরের দিন সকালে আবার বুটের ডাল দিয়ে বাসি লুচি দিস্তে দিস্তে। সেই গল্পে বলে না, বিয়েবাড়িতে অতিভোজনে এক অতিথির দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা। হেকিম বলছেন, বাবা জল দিয়ে দুটো হজমি বড়ি খাও। রোগীর কাতর স্বর 'প্যাটে সে জায়গা থাকলে তো আরও দুটো দরবেশ খেতাম হুজুর।'

হাসিবুলেরও সেই অবস্থা। আইঢাই। সন্ধ্যের পর থেকে পেটটা ছাড়ল দারুণ মোচড় দিয়ে। তিন ঘণ্টায় সাতবার। হাতুড়ে নবীন ডাক্তারের গুলি আর নুন-চিনির সরবতে দাস্ত বারে কমেছে। বেগ আসছে দেরিতে। মোচড় মারাটাও কমে এসেছে। নিজের লোভকে ধিক্কার দিয়ে হাসিবুল এক কোণে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়েছিল। বেশ জ্বর জ্বর ভাব। হালকা ঘুম ভেঙে গেল আবার পেটের মোচড়ে। নাঃ আবার মাঠে সারতে যেতে হবে। রাত কত বোঝা যায় না। অমাবস্যা আকাশে চাঁদ দেখেও রাত্রি বোঝার উপায় নেই। মাথার উপর তারাগুলো ঝকঝক করছে। দরজার কাছে রাখা জলের বদনাটা নিয়ে লুঙ্গি গুটিয়ে হাসিবুল আবার চলল 'অভিসারে'।

চারদিকে বেশ ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্বাধীনতার সাত দশক পরেও রাজ্যের রাজধানী ছাড়িয়ে সত্তর মাইল পৌঁছায়নি বিদ্যুৎ। খুঁটিগুলি শুধু দু-হাত তুলে হাহাকার করার মতো দাঁড়িয়ে আছে। সীমান্তের ওপারে কিছু কিছু গাঁয়ে আলো জ্বলে—ওপার থেকে দেখা যায়।

অন্ধকারে ঠাওর করে লুঙ্গি বাঁচিয়ে হাসিবুল রাত দুপুরে প্রাতঃকৃত্য সমাধান করে ভারী আরাম পেল। পেটটা বেশ খোলসা লাগছে। ফুরফুরে হাওয়া হাত দিয়ে আড়াল করে ট্যাঁকে গোঁজা বিড়িটা দু-বার ঠুকে মাচিস্

অপার্থিব মায়াময় আলোয় দেখা যাচ্ছে সবজি খেতে কিছু পোকা উড়ছে। তাদের গায়েও যেন নীলচে আলোর ছোপ।

দিয়ে জ্বালানো গেল। আঃ শান্তি। উঠে দাঁড়াল হাসিবুল। নিঃস্তব্ধ শীতের রাত্রে একটানা ঝিঁঝির শব্দ। সাপের ভয় নেই। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে কয়েক পা এগোতেই হঠাৎ চোখ পড়ল, একটু দূরে সনাতন হাজরার সবজির বাগানে কেমন যেন একটা ভুতুড়ে নীলচে আলো। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে একটা অদ্ভুত রং তৈরি করেছে। কিন্তু আলোটা স্থির নয়। ব্যাটারিতে জ্বলা টুনি লাইটের মতো দপ দপ করছে। মাঝে মাঝে যেন একটু রঙও পালটাচ্ছে। ওই অপার্থিব মায়াময় আলোয় দেখা যাচ্ছে সবজি খেতে কিছু পোকা উড়ছে। তাদের গায়েও যেন নীলচে আলোর ছোপ।

হঠাৎ হাসিবুল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এ কি জিন পরীদের কাণ্ড? নাকি স্বয়ং ইবলিশের কারসাজি? কী ঘটছে সনাতনচাচার সবজি খেতে? দৌড়ে পালাতে গিয়ে মোটা অশ্বত্থগাছটার শিকড়ে পা বেঁধে উলটে পড়ল হাসিবুল। বদনাটা ছিটকে গেল দূরে। ইটে মাথা ঠুকে কী হল তারপর হাসিবুলের আর তা মনে নেই।

॥২॥

নিশির ডাক

নদিয়া জেলার তেহট্ট-তে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম জয়ভবানীপুর। আগে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। ভবানী মন্দিরের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বহুদূর—গ্রামের নামেই তা মালুম হয়। কিছু দূর দিয়ে বয়ে গেছে চূর্ণির এক ছোট্ট উপনদী। প্রায় ছয়শো বছরের প্রাচীন মা কালী বা ভবানীর মন্দির আজ ভগ্নপ্রায়। বট-অশ্বত্থ গাছের গ্রাসে দেওয়ালগুলি আবদ্ধ— মাকড়সার জালের মতো। বিগ্রহ বহুদিন আগেই চুরি হয়ে গেছে। গ্রামবৃদ্ধেরা বলেন অষ্টধাতুর সেই জাগ্রত করাল মূর্তি থেকে নাকি কালীপূজোর রাত্রে কাঁচা রক্ত গড়াত। অবশ্য সেই জাগ্রত বিগ্রহ কেন নিজের অপহরণ ঠেকাতে পারেননি, জিজ্ঞাসা করলে প্রাচীন পুরোহিত বংশের শেষ প্রতিভূ ধূর্জটিপ্রসাদ কপালে দু-হাত ঠেকিয়ে বলেন 'সবই মায়ের ইচ্ছা। তিনি আমাদের অনাচার সহ্য করতে না পেরে নিজেই চলে গেছেন।' পুলিশের খাতায় Closed Case হিসাবে লেখা আছে। সম্ভবত মার্কিন মুলুকে কোনো ধনকুবেরের লিভিং রুম আলো করে আছেন কালী কৈবল্যদায়িনী। মোট কথা সন্ধান মেলেনি।

দেবীর অন্তর্ধানের ঘটনাটা প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরানো। তবুও কুলপ্রথা মেনে বৃদ্ধ ধূর্জটিপ্রসাদ ভট্টাচার্যি প্রতি শনি-মঙ্গলবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে একবার মন্দিরে যান প্রদীপ দেখাতে, ধূপ দিতে। গ্রামের অতীত গৌরব অস্তমিত। মেধাবী বা মোটামুটি সম্পন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা সবাই ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতা-ব্যাঙ্গালোর–নিউইয়র্কে। গরিবগুরবো ঘরের বখাটে কিশোর থেকে যুবকদের প্রধান পেশা চোরাচালান। মধ্যবয়সিরা আজও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষবাস করে। পেটটা চলে যায়, কিন্তু শখ আহ্লাদ মেটে কই! বীজ, সার, পোকা মারার ওষুধ আর ডিজেলের দাম বেড়েছে বহুগুণ। পাল্লা দিয়ে কমেছে ফসলের দাম। সরকারের কাছে ধান বেচা মুশকিল। নিয়মিত সংগ্রহের ক্যাশ হয় না, টাকা মেলে চেকে—চার ছয়মাস পরে। আর বাবুদের মেজাজ কী! ওদিকে ফসল উঠলেই মহাজনের তাড়া। গ্রামীণ ব্যাঙ্কে কৃষিঋণের টাকা আসে চাষের মরসুমের পরে, তাও আবার ২৫% কমিশন দিতে হয়। ধারের টাকা হাতে পেলে দু-চারদিন মাছ-মাংস-মিষ্টির মোচ্ছব হয় চাষির ঘরে—কিন্তু আসল কাজে লাগে না। সংবচ্ছর মহাজনই ভরসা। চাষির ঋণ, বিমার কার্ড সব বড়ো দূরের জিনিস। মহাজনের সুদ মাসে ১৫% থেকে ২০%। তাই ফসল বেচতে হয় ফড়ের কাছে। অনেক

কম দামে—কিন্তু নগদ মেলে। এইভাবে চক্রাচারে চলে ভোলা বাউড়ি, হাসেম শেখদের জীবন।

কিন্তু টাটকা জোয়ানদের দু-হাতে আয়। প্যাকেটগুলো এপার ওপার করে দিলেই হাতে দামি মোবাইল, কানে সোনার দুল, পায়ে স্নিকার। অনেকেরই দু-চাকা। সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে দরাদরি ঠিকমতো হয়নি বলে গতমাসে একটা গুলি খেয়ে মরেছে। আর একটার বোনের উপর বিএসএফ-এর তিনটে জোয়ান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আটকাতে গিয়ে তারও পেট ফুটো হয়েছে। এছাড়া প্রায় সবই শান্তিপূর্ণ। গোলমাল বিশেষ নেই, আছে সহাবস্থান।

ধূর্জটিপ্রসাদের আজ বড়ো দেরি হয়ে গেছে। দুপুরে আফিমের মৌতাতটা যখন ভাঙল তখন সূয্যিমামা পাটে বসেছেন প্রায়। শীতের সন্ধ্যা হালকা কম্বলের মতো জড়িয়ে ধরছে গ্রামটাকে। একবার ভাবলেন আজ আর যাবেন না। কিন্তু নাঃ, ষাট বছরের অভ্যাস। লাঠি নিয়ে বার হতেই হল ধূপ, দেশলাই আর প্রদীপসহ। মন্দিরের কাছে যখন পৌঁছালেন চারিদিক নিঃঝুম। শীতকালে ব্যাঙেরাও শীতঘুমে। ধূর্জটিপ্রসাদের চোখে কেমন ঘোর লাগল। এই বয়সেও তাঁর চশমা লাগে না। কিন্তু মন্দিরের চারপাশে ঘাসপালা ঝোপজঙ্গলে কেমন যেন একটা নাতি-উজ্জ্বল নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কই গত মঙ্গলবারও এমন দেখেননি। আর আলোটা স্থির নয়। জোনাকির মতো দপদপ করছে। ধূর্জটির মনে পড়ল বহু প্রাচীন বংশ-প্রবাদ। 'মন্দির চারপাশে যেদিন অলাতচক্র দেখবে, সেদিন এই জয় ভবানীপুরের শেষ'—বলেছিলেন প্রপিতামহ দিগম্বরীপ্রসাদ। অজানা আতঙ্কে বৃদ্ধের মাথা ঘুরে গেল। ভূমিশয্যা নিলেন ''মা তারা'' বলে। পূজার উপাচার ছড়িয়ে গেল চারদিকে। ভূমিলগ্ন ধূর্জটিপ্রসাদের মাথার উপর দিয়ে অনেকগুলি বাদুড় উড়ে যেতে লাগল লাহিড়ীদের ফলবাগানের দিকে। নিঃশব্দ পক্ষসঞ্চারে।

॥৩॥

বিষের বাঁশি

পশ্চিমবঙ্গের তিনশো একচল্লিশটি ব্লকের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ ব্লক পাথরপ্রতিমা। তার থেকে ভুটভুটিতে চারঘণ্টার রাস্তা হল 'জিপ্লট'। উপকূল রক্ষীদের স্পিডবোটে যাতায়াত করলে অবশ্য আড়াই ঘণ্টায় হয়ে যায়। কিন্তু গোপনীয়তার স্বার্থে সুরজিৎ সেন সাধারণ ভাড়া গাড়িতে চেপে পাথরপ্রতিমা পৌঁছান। সেখান থেকে দুই সিলিন্ডারের ভুটভুটিতে জিপ্লট। সকাল ছ-টায় কলকাতা থেকে বেরোলে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় পৌঁছোতে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাকা বাড়ির দোতলায় দেড়খানা ঘরে সুরজিতের থাকার ব্যবস্থা। একটা শোবার ঘর, সঙ্গে একচিলতে স্টাডি। খাবার দু-বেলা আসে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের Self Help Group-এর ক্যান্টিন থেকে। চা-মুড়িটাও জোটে। মাঝে মাঝে তেলেভাজা বা নিমকি।

[*স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র পাতায় 'কে?' গল্পটি যারা পড়েছেন তাদের হয়তো সুরজিৎকে মনে থাকবে। প্রতিভাবান জীব-অণু বিজ্ঞানী (Molecular Biologist) যিনি ইবোলা ও টোবাকো মোজেস-এর সংকর প্রাণঘাতী সেই ভয়ংকর ভাইরাসের রহস্য ভেদ ও নির্মূল করেছিলেন। এখন তিনি ICMR-এর বিশেষ আধিকারিক বা Special Officer on Duty। সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম জিন-সত্যান্বেষী]।

সুরজিৎ পনেরো দিন আগে এসেছেন এখানে। কিছু কৃষিজীবী ও মূলত ধীবরদের আবাসস্থল এই 'জি প্লটে'। গণহারে সামুদ্রিক মাছেদের মৃত্যুর তদন্ত করতে। গত প্রায় এক বছর ধরে মাছেদের দ্বীপের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। মৎস্যজীবীদের হাহাকারের ক্ষীণ শব্দ বহু কান-ফেরতা হয়ে তিনমাস আগে কর্তৃপক্ষের গোচরে এলে সুরজিৎকে এখানে পাঠানো হয়েছিল আরও একজন জীববিজ্ঞানী এবং পশু চিকিৎসকের সঙ্গে। অন্য দু-জন একমাসেই দায়সারা রিপোর্ট দাখিল করে এই পাণ্ডববর্জিত বিদ্যুৎহীন নির্বাসন থেকে উধাও। সুরজিৎ কিন্তু লেগে আছেন, নমুনা সংগ্রহ করছেন, ফিরে যাচ্ছেন কলকাতায়। কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর আবার ফিরে আসছেন সন্তর্পণে, কোনো ঢাকঢোল না পিটিয়ে। তাঁর মনে দেখা দিয়েছে সন্দেহ, গভীর সন্দেহ।

এ দ্বীপে অন্তর্জাল (Internet) চলে না; ই-মেল, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ অকেজো। জরুরি প্রয়োজনের সাথি স্যাট ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল রাত ন-টার সময়। ওপাশে ড. রেড্ডি, ডেপুটি ডিরেক্টর। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তাঁর 'Surajit, Come back to Kolkata tommorrow I am here, waiting for you. Urgent, very urgent'। ড. রেড্ডি দিল্লি থেকে যখন স্বয়ং ছুটে এসেছেন তখন জরুরি বই কী। তাও সাহস করে সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করলেন 'কী ব্যাপার স্যার! একটু আভাস দিন . . .'। ফোনের স্ক্রিনে দেখা গেল রেড্ডির ঠোঁটে কাষ্ঠহাসি 'The poisonous flute is ringing, son'—অর্থাৎ বাছা বিষের বাঁশি বাজছে।

॥৪॥

খুঁজে খুঁজে ফিরি . . .

কী? কেন কীভাবে?

তিনটি প্রশ্ন শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে বোর্ড রুমের চকচকে টেবিলে জমা হওয়া অসংখ্য নথিপত্র, রিপোর্ট, কম্পিউটার প্রিন্টআউট-এর স্তূপে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। ঘরে জনা কুড়ি মানুষ—সবাই নিস্তব্ধ। কৃষিমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, মুখ্যসচিব সবাই হাজির। ভিডিও স্ক্রিনে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বিগ্ন মুখ। আর আছেন রাজ্যের ও কেন্দ্রের নামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নানা অধিকর্তা। কফির কাপ থেকে ধোঁয়া উঠে উঠে ঠান্ডা হয়ে গেছে। কেউ ঠোঁট ছোঁয়াননি। কাজুবাদামের প্লেটও অস্পৃষ্ট।

নীরবতা ভেঙে মুখ্যসচিব বললেন 'দেখুন আমি ইতিহাসের ছাত্র। বিজ্ঞানের অনেক কিছুই বুঝি না। কিন্তু এই যে আলো জ্বলা ঘাস, আলো জ্বলা ফসল এমনকী গবাদি পশুদের মল-মূত্রেও নীল আলোর ঝলকানি—এই ভূতুড়ে কাণ্ডের মানে কী? এটা তো গত একমাসে আন্তর্জাতিক খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাজার হাজার ই-মেলে ইনবক্স উপচে পড়ছে। সংবাদ মাধ্যম দু-বেলা ছিঁড়ে খাচ্ছে। সি.এম.—পি.এম দু-জনেই দারুণ উদ্বিগ্ন। এর অর্থ কী? আপনারা প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, কিছু করুন . . .।' শেষদিকে দুঁদে আমলার গলায় ঝরে পড়ল আর্তি। তাঁর কথা শেষ না হতেই ককিয়ে উঠলেন কৃষি সচিব 'আমরা তো আক্রান্ত এলাকায় সমস্ত ফসল বেচাকেনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছি। কিন্তু মানুষ খাবে কী? বাঁচবে কী করে? হিলি থেকে হাসনাবাদ—প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ধরে

সব কৃষিজমির একই তো অবস্থা। আর আবাদি জমিতে নীল আলো জ্বলা ফসলের এলাকা ক্রমে ক্রমে ভিতরের দিকে ঢুকে আসছে। বাড়ছে, প্রতিদিনই বাড়ছে।' মুখ্যসচিবের নির্দেশে স্ক্রিনে ফুটে উঠল পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের সীমান্তের ম্যাপ। ওপারে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, যশোর। আর এপারে দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দুই চব্বিশ পরগনা। এপারের সীমান্ত ধরে টানা নেমে এসেছে লাল লাল ফুটকির সারি। পাশে নাম লেখা হিলি, কুসুমগ্রাম, চৌডাঙা, বালুরঘাট। মালদার হাবিবপুর, সাঁকরোল, দিলালপুর। মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ান, সুতি, লালগোলা, জলঙ্গী, নাওড়া, আমতলা। নদীয়ার আধারকোটা, শিকারপুর, বেতাই, তেহট্ট, ছাবড়া হয়ে নেমে এসেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ, বাগদা, স্বরূপনগর, হয়ে হাসনাবাদ পর্যন্ত। অতি উর্বর এই সব জমি। হাজার হাজার কৃষকের, কৃষক পরিবারের বেঁচে থাকার অবলম্বন। বাংলার খাদ্য সম্ভার। আজ এক অদ্ভুত অজানা রোগে আক্রান্ত। এখবরও এসেছে যে ওই ঘাস বা গাছপালা খেয়ে বেশ কিছু গবাদি পশু মারা পড়েছে। এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছে দারুণ আতঙ্ক। দলে দলে মানুষ ঘর-খামার ছেড়ে পালাচ্ছেন।

এতক্ষণ বাদে কৃষিমন্ত্রী মুখ খুললেন 'ড. রেড্ডি আপনাদের দপ্তরের ড. সুরজিৎ সেন-কে কি ডেকে পাঠিয়েছেন?' 'হ্যাঁ স্যার, বাইরে অপেক্ষা করছে সুরজিৎ'—সহ অধিকর্তার উত্তর। 'ওঁকেই দায়িত্ব দিন। আমি ম্যাডামকে বলে হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কাল সকালেই আপনারা দু-জনে বেরিয়ে পড়ুন আক্রান্ত এলাকাগুলি দেখে নমুনা সংগ্রহের জন্য। গাছপালা, পশুপাখি যা কিছু দরকার। আমি পাঁচটা জেলারই ডি.এম. ও এস.পি-কে বলে রাখছি।'

দু-দিন গেল নানা নমুনা সংগ্রহ করতে। কোথাও জনশূন্য গ্রাম প্রেতপুরীর মতো পড়ে আছে। কোথাও মানুষেরা আতঙ্কে দরজা বন্ধ করে বাড়িতে। চাষবাস থেকে বাজারহাট সবই বন্ধ। অজানা আতঙ্ক গ্রাস করেছে সবাইকে। সংগৃহীত নমুনা চিহ্নিত করে, ট্যাগ লাগিয়ে নানা বায়ুনিরোধক জীবাণুশূন্য প্যাকেটে করে পৌঁছাল গবেষণাগারে। পরীক্ষার টেবিলে। সুরজিৎ সহকারীদের নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাইরে ঝুলল D.N.D. (Do not Disturb) বোর্ড।

॥৫॥

আলেয়ার আলো

এই আলোর উৎস কী? তা যেন কোনো বংশাণু বা জিনগত পরিবর্তন তা আগেই মনে হয়েছিল সুরজিতের। কোনো পরাব্যক্তি বা 'মিউটেশন?' কিন্তু এত ব্যাপক? এত দ্রুত? সমস্ত ধরনের ফসল মায় ধানও এতে আক্রান্ত?

এ তো প্রায় অবিশ্বাস্য! জৈব নমুনাগুলি থেকে DNA নিষ্কাশন, জীব রসায়নের নানা আধুনিক পদ্ধতিতে তার মধ্যেকার প্রোটিনগুলি নির্ণয় করা, PCR এবং DNA Sequencing পদ্ধতিতে ধান, বেগুন, শিম, পালং শাকসহ নানা ফসলের বংশাণুর মানচিত্র (Gene Mapping) তৈরি করে—এক বিপুল কর্মকাণ্ড। কাজ চলছে ঘড়ি ধরে, নিঃশব্দে। দিনে আঠারো ঘণ্টা। পরীক্ষার টেবিলেই স্যান্ডউইচ-এর একটা কামড় বা কফির কাপে চুমুক। পেট্রিডিস, অটোপিপেট-এর ঠুংঠাং, ইলেক্ট্রোফোরেসিস বা সিকোয়েন্সার-এর হালকা মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সুরজিৎ ও তার ছয়জন সহকর্মীর কাজ চলছে যন্ত্রের মতো। শর্ত একটাই। কোনোভাবে বিরক্ত করা চলবে না। চাওয়া যাবে না কোনো অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট। অপেক্ষা করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। অন্তহীন অপেক্ষা . . .।

আটদিন বাদে সকাল দশটায় মলিক্যুলার বায়োলজি ল্যাবের দরজা খুলল। ড. রেড্ডি প্রবেশ করলেন। সুরজিৎ টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে উঁচু টুলে বসে। অবিন্যস্ত জামাকাপড়। রেড্ডি কাঁধে হাত ছোঁয়াতে রাতজাগা ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ দু-টি তুলে সুরজিৎ বললেন 'স্যার শয়তানের পরিকল্পনা। বিরাট কোনো কর্পোরেটের কারসাজি। চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছি কিন্তু বেরোবার রাস্তা এখনও জানি না স্যার।'

প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান যে শেষ হয়েছে, কোনো একটা দিশা হয়তো-বা মিলেছে—এই খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল। গবেষণাগারের চারপাশে বিশেষ নিরাপত্তা বলয়। গেটের ওপারে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে উদ্‌গ্রীব জনতাকে আর ওবি ভ্যানগুলিকে। বুম হাতে সাংবাদিকরা পারলে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েন। খবর এল মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এবং সপারিষদ আসছেন। ভিডিও স্ক্রিনে হাজির হবেন কেন্দ্রের কৃষিমন্ত্রীও।

॥৬॥

শেষ কথা কে বলবে?

বেশ কিছুক্ষণ নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর ড. রেড্ডির অনুরোধে কনফারেন্স রুমে মুখ খুললেন সুরজিৎ। ভাঙা, বসে যাওয়া ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন —'মাফ করবেন, পুরো বিষয়টি বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। আধুনিক জীব বিজ্ঞানের অনেক খুঁটিনাটি, নানা প্রকৌশল—যা এখনও আমাদের দেশে আসেনি, যা কেবল আমরা পড়েছি বিদেশি জার্নালে বা ইন্টারনেটের পাতায়, তার গভীরে আমি যাব না। আর এর সঙ্গে কেবল শুকনো বিজ্ঞানচর্চা নয়, যুক্ত রয়েছে রাজনীতি আর অর্থনীতি। সবকিছু ছাড়িয়ে কর্পোরেট লালসা। মানুষের রক্ত-মাংস-মজ্জা-হাড় সবকিছুকে ডলারে পরিণত করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রকৃতিকে নির্মমভাবে লুণ্ঠন করে, ধ্বংস করে পুঁজিতে পরিণত করাই এইসব কোম্পানির কর্মসূচি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এরা নাৎসি বাহিনীকে মারণ গ্যাস সরবরাহ করত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-এর জন্য। নুরেমবার্গ বিচারে যুদ্ধ অপরাধীর তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায় কোটি কোটি ডলার বা মার্ক ঘুষ দিয়ে।'

এক ঢোক জল খেয়ে সুরজিৎ আবার শুরু করলেন 'এই সব হত্যা ব্যবসায়ী কোম্পানি বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন নামে, নতুন চেহারায় উদয় হল সার, বীজ ও কীটনাশক প্রস্তুতিকারক হিসাবে। মনে রাখবেন ডিডিটির প্রথম উদ্ভব হয়েছিল যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে। এদের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধল পেট্রোকেমিক্যাল ও রাসায়নিক সার উৎপাদক দানবেরা। বিগত শতাব্দীর শেষ অর্ধাংশে এরা দারুণ ফুলে ফেঁপে উঠল।'

কৃষি অধিকর্তা বলে উঠলেন 'আরে এ তো ধান ভানতে শিবের গীত। এর মানেটা কী?' 'চুপ! ওনাকে বলতে দিন। একদম বিরক্ত করবেন না।' তীক্ষ্ণস্বরে ধমকে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং।'

চশমার কাঁচটা রুমালে পরিষ্কার করে সুরজিৎ ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন 'আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। সংক্ষেপে বলি, ত্রিশ-চল্লিশ বছরেই পেট্রোপণ্যের ব্যাবসা ফলাও করার জন্য রকফেলার ফাউন্ডেশন ও কর্নেল

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পিত প্রথম সবুজ বিপ্লবের ব্যর্থতা ফুটে বেরোল। জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে গেল, জলস্তর নেমে গেল অনেক নীচে। টনটন রাসায়নিক সার আর কীটনাশক ঢেলেও ফসলের পরিমাণ তেমন বাড়ল না। অথচ চাষের খরচ বেড়ে গেল বহুগুণ। এখন এরা নতুন প্রকৌশলের নামে আনল বংশাণু পরিবর্তিত বীজ বা Genetically Modified Seed, যার থেকে তৈরি ফসলে নাকি পোকা লাগবে না, কীটনাশক দরকার হবে না, ফলন হবে বেশি। দুঃখের বিষয় সরকারি কর্তাব্যক্তিরাও তা বিশ্বাস করলেন। সরকারি বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের দিয়েই এরা প্রচারের কাজটা অর্ধেক সেরে ফেলল।'

একটু দম নিতে থাকলেন সুরজিৎ। মুখ্যসচিব বলে উঠলেন 'এক মিনিট ড. সেন। আমাদের এই বিপর্যয় কি তবে এমনই কোনো ষড়যন্ত্রের কারণে?' 'ঠিক তাই স্যার। আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ করে এবং নমুনা বিশ্লেষণ করে আমি যা পেয়েছি তা ভয়ংকর। বিটি তুলোর কথা আপনারা শুনেছেন। এই বংশাণু পরিবর্তিত তুলোর বীজ আজ ভারতের সর্বত্র। উধাও হয়েছে বেশি তুলোর সমস্ত প্রজাতি। একইভাবে সবুজ বিপ্লবের আগে আমাদের দেশে ছিল প্রায় ৫৫ হাজার ধরনের ধান। আজ পাওয়া যায় মাত্র গোটা কুড়ি। অথচ সেই সব বিরল ধানের জিন বা জার্মপ্লাজম গোপনে পাচার হয়ে গেছে বিদেশে। বিটি তুলোর ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল এ তুলোর বীজ অনেক দামি হলেও তাতে ফসল হবে প্রচুর। অথচ ফসল না হওয়ার ফলে কৃষকদের ধারাবাহিক আত্মহত্যা ও কৃষক পরিবারের হাহাকারে ভরে গেছে ভারতবর্ষের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল।

'এমনই একটি দানব কোম্পানির নাম আপনারা হয়তো শুনেছেন, সীডমান্টো। এদের বার্ষিক মুনাফা বহু দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের চেয়েও অনেক বেশি। এই সীডমান্টো কোম্পানির উদ্দেশ্য হল ভারতে সমস্ত ধরনের দেশীয় বীজ একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া এবং নিজেদের পেটেন্ট করা বংশাণু পরিবর্তিত ধান, আলু, ভুট্টা বা নানা সবজির বীজ ভারতে চালু করা যাতে দু-হাজার কুড়ি সালের মধ্যে ভারতের সমস্ত বীজের বাজার তারা দখল করতে পারে। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞানী ও সচেতন মানুষের প্রতিরোধে এবং আদালতের রায়ে এখানে বিটি বেগুনের বীজ তারা চালাতে পারেনি। ফলে তারা এক ভয়ংকর শয়তানির পথ নেয়।

'পাশের দেশের সরকারকে বশ করে রাজশাহী, খুলনা এবং রংপুরে গোপনে চালু করে দশ ধরনের বংশাণু পরিবর্তিত বীজের চাষ।'

ড. রেড্ডি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন, এবার বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও সুরজিৎ, বিটি বেগুনের ব্যাপারটা তো আলাদা। তার সঙ্গে এই নীল আলো জ্বলা ঘাসের সম্পর্ক কী?'

'সেটাই বলতে যাচ্ছি স্যার। বিটি (BT) বা অন্য জি এম (GM) ফসলের কথা আজ বৈজ্ঞানিক মহলে সবাই জানেন। Gene Gun দিয়ে Bacteriophase-কে বাহক করে, কীভাবে মাটির ব্যাকটিরিয়া *Bacillus thuringiasis*-কে ভুট্টা, বেগুন বা আলুতে ঢুকিয়ে দিয়েছে সীডম্যান্টো, তা নিয়ে অনেক লেখাপত্র হয়েছে। এই ব্যাকটিরিয়ার তৈরি CRY1 প্রোটিন বেগুনের Stem Borer পোকাকে মারে, তুলোর বোলওয়ার্ম-কে মারে—কিন্তু উপকারি পতঙ্গও ধ্বংস করে। সবচেয়ে বড়ো কথা ক্রমে ক্রমে ইতর পরাগসংযোগ মারফত সব বীজই হয়ে দাঁড়ায় GM বীজ।'

এক ঢোক জল খেয়ে সুরজিৎ আবার বলতে লাগলেন 'এরপর ওই কোম্পানি হাত দিল সাধারণ মার্কিন ঘাসে—যার নাম Kentucky bluegrass। তৈরি হল Glyphosate resistant bluegrass। এই ঘাস হল সাধারণ ঘাস বা *Poa pratensis*-এর ট্রানজেনিক (জিন পরিবর্তিত) জাতি। Scott Miracle-Gro নামে ওহিও-র এক উদ্যান পরিচর্যা কোম্পানির সঙ্গে হাত মেলায় সীডম্যান্টো। উদ্যান পরিচর্যা কোম্পানিটির উদ্দেশ্য ছিল এমন ঘাস লাগানো যাতে বাগানে আগাছা না গজায়। *Agrobacillis tumefaciens* নামক ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে সীডমান্টো ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে ফুলকপির Cauliflower mosaic virus। ওই সব নমুনার Gene Mapping করতে গিয়ে আমরা তার সন্ধান পেয়েছি। পেয়েছি গবাদি পশুর মধ্যেও। মজার ব্যাপার হল আমেরিকাতে যে কর্তৃপক্ষ GM উদ্ভিদকে ছাড়পত্র দেয়, তারা বলেছে তাদের কারবার সবজি নিয়ে। *Transgenie grass*-কে তারা আটকাতে পারে না। এ খবর আমি পেয়েছি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নাল *Nature*-এর ২০ জুলাই, ২০১১ সংখ্যায়।'

'এই বংশাণু পরিবর্তিত ঘাস অতি দ্রুত বাড়ে এবং দপদপ করে আলো ছড়ায়। কারণ এর মধ্যে আরও ঢোকানো হয়েছে *Arabidopsis thaliana* বলে নীল-সবুজ আলো দেয় এক ধরনের আগাছার জিন। এরা Luciferin নামক প্রোটিন তৈরি করে, যা জোনাকিতেও পাওয়া যায়। সেই বংশাণু পরিবর্তিত ঘাসের বীজ ওরা ছড়িয়ে দিয়েছে সীমান্তের ওপারে।'

'দাঁড়ান দাড়ান' প্রশ্ন করলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ওই কোম্পানির এতে লাভ কী? আলোজ্বলা ঘাসের বীজ ছড়িয়ে? তাও আবার আমাদের সীমান্তে? তাছাড়া এই জোনাকির জিন না কী, মানে যার জন্য জোনাকি দপদপ করে, সেটা ঘাসের মধ্যে চালান করবে কীভাবে? আর তাতে ঘাস, গাছপালাও দপদপ করবে? তাতেই বা ওই বীজ কোম্পানির কী সুবিধা হবে? ওরা আমাদের কাছেও এসেছিল কী সব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে। আমরা রাজি হইনি।'

সুরজিৎ একটু হাসলেন 'ম্যাডাম আগেই বলেছি বিষয়টা জটিল। আর পুরোটা প্রমাণিতও নয়, অনেকটাই আমার অনুমান, কারণ এদের কার্যকলাপ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। তত্ত্ব ও প্রযুক্তিগুলি সংক্ষেপে বোঝানো মুশকিল। বিষয়টা হল এক উদ্ভিদ বা প্রাণীর জিন বা বংশাণু, যা বংশগতির বাহক, তাকে অন্য অসম্পর্কিত জীব বা প্রাণীর মধ্যে চালান করা যায়। যেমন—মাছের জিন ফুলে, ব্যাকটিরিয়ার জিন সবজিতে বা ফলের জিন পতঙ্গে। খোদার উপর খোদকারি আর কি। অনিয়ন্ত্রিত জিন চালানের ফলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। তৈরি হতে পারে নানা ক্ষতিকারক জীব। তারপর মৌমাছি, প্রজাপতি বা অন্যান্য পতঙ্গের মারফত তা ছড়িয়ে পড়ে বিশাল এলাকা জুড়ে—যাকে বলে ইতর পরাগসংযোগ বা Cross Pollination। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন Vertical Gene Transfer। ফলে একধরনের শস্য বা সবজি থেকে ওই দূষিত জিন ছড়িয়ে পড়ে সব ধরনের ফসলে। ক্রমে সব ফসলই বংশাণু পরিবর্তিত ফসলে পরিণত হয় সঙ্গোপনে। এতে কোম্পানির লাভ হল দেশীয় সমস্ত বীজের প্রজাতি ধ্বংস হয়ে গিয়ে টিকে থাকে শুধু বংশাণু পরিবর্তিত বা GM বীজ। তা হল পেটেন্টভুক্ত। ফলে কোম্পানিই হয়ে ওঠে একচেটিয়া বীজ বাজারের অধিকারী। চাষিরা বছর বছর কোম্পানির ঘর থেকে বীজ কিনতে বাধ্য হয়

চড়াদামে—নইলে পেটেন্ট ভঙ্গের দায়ে মামলা। তার যে খেতে একবার GM Seed ঢুকছে তাতে সাধারণ বীজে ফসলও হয় না। এই হল সীডম্যান্টোর নীল নকশা। আগেই তো বললাম, ওদের নথিতেই আছে ২০২০ সালের মধ্যে উপমহাদেশের সমস্ত বীজকেই ওরা GM-এ পরিণত করবে।'

'বছরের এই সময়টাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঝোড়ো বাতাস বয়। সেই বাতাসে বাহিত হয়ে তার পতঙ্গের মাধ্যমে ওদিকের দূষিত বীজ এসে পড়েছে সীমান্তের এদিকে।'

'ঘাসের দেহে লুসিফেরিন (Luciferin)-এর জিন ভয়ংকর কাজ করেছে। হয়তো গবেষণাগারে পুরোটা ওদের জানা ছিল না। উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে তার ফল হয়েছে মারাত্মক—যাকে বলে Biological Multiplication। জিন দূষিত ঘাসেদের বৃদ্ধি হচ্ছে হু হু করে। আমি ল্যাব-এ দেখেছি। দ্রুত এই বিকৃত জিন ছড়িয়ে যাচ্ছে অন্যান্য শাক-সবজিতে। খবর নিলে দেখবেন বাংলাদেশের দিকেও নিশ্চয়ই এমন ঘটনাই ঘটছে।'—থামলেন সুরজিৎ।

'আপনার অনুমান যদি সত্য হয়' কৃষিমন্ত্রী বললেন, 'এই ধরনের জিনবাহী ফসল কি মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটাতে পারে?'

'কে জানে স্যার? কী করে বলা যাবে এখনই? যে ক-টি গোরু ছাগল মারা গেছে তাদের ময়না তদন্তের রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। সকলেরই দেহের ভিতরে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দারুণ রক্তপাত ঘটেছে। অকেজো হয়ে গেছে যকৃৎ ও কিডনি। ওই ঘাস বা গাছপালা খাওয়ার ফলে হতেই পারে। মুনাফার লালসায় সীডম্যান্টো, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করে প্রকৃতিতে ছেড়ে দিয়েছে। কে জানে তার শয়তানি ক্ষমতা কতদূর . . .' সুরজিতের গলা ম্রিয়মাণ হয়ে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী বলে উঠলেন 'কী ভয়ংকর শয়তানি। ওরা ওইসব বীজ নিয়ে আমাদের সরকারের কাছেও এসেছিল। সরকারি অফিসারদের মধ্যে ওদের অনেক দালাল আছে। তারা বলছিল এতে নাকি রাজ্যের চাষবাসের দারুণ উন্নতি হবে। বলছিল— Field Trial-এর জন্য জমি দেওয়া হোক। কিন্তু আমি রাজি হইনি। তাই ওপারে গিয়ে এইসব শয়তানি করছে। ওদের দালালগুলোকে তাড়াতে হবে। কী ড. রেড্ডি, ড. সেন এখন আমরা বাঁচব কীভাবে?'

সুরজিৎ বললেন 'বাঁচার উপায় আমার সঠিকভাবে জানা নেই। তবে এইসব ঘাসগুলো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি এরা দ্রুত বাড়ছে কিন্তু দ্রুত মরেও যাচ্ছে। কিছুটা সুরাহা হয়তো প্রকৃতি নিজেই করবেন। আর উপায় হল ওই এলাকার বাইরে একটা ঘাসশূন্য বলয় তৈরি করা—যেমন অনেক সময় দাবানল ঠেকাতে করা হয়। বড়ো ক্লান্ত লাগছে ম্যাডাম। সাতদিন ঘুমোইনি। একটু যেতে পারি কি?'

অনুমতি নিয়ে ড. সেন বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ভিতরে প্রচুর তর্কবিতর্ক চলছে। সুরজিৎকে সেসব স্পর্শ করল না। মুখ তুলে গোধূলির আকাশের দিকে চাইলেন তিনি। অস্তগামী সূর্যের সোনার রং শেষবেলায় ছড়িয়ে যাচ্ছে চরাচরে। বিজ্ঞানীর মন কিন্তু দুঃখে ভারাক্রান্ত। যে সত্য তিনি জেনেছেন তা এত বীভৎস এত ভয়ংকর যে তা না জানলেই ভালো হত। বহু দূরের দৃষ্টি প্রসারিত করে সুরজিতের মনে হল আজই বোধহয় মানুষের লোভে এই সুন্দর পৃথিবীর অন্তিম দিন। হাজার হাজার পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের মতোই এই প্রকৌশল পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে। কোথাও যেন কোনো আশার আলো অবশিষ্ট নেই। সুরজিৎ মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন আলো আঁধারি বারান্দা ধরে।

[সত্য ঘটনার আংশিক অনুকরণে] স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত এমবিবিএস, ডিসিপি, এমডি, প্রাবন্ধিক এবং স্বাস্থ্যের অধিকারের লড়াইয়ের এক সংগঠক।

advt.

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

৩১, প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

যোগাযোগ ঃ ৯৮৩৬৪৭৭১৯৫, ৯৮৩০৬৭৩৫১২

এছাড়া কমবয়সীদের জন্য আছে আকর্ষণীয় গল্প-ফিচার-ছবিতে ঠাসা কিশোর যুক্তিবাদী

টুকরো খবর

এই ক্যান্সার চিকিৎসায় শরীর নিজেই নিজের ঘাতক হয়ে উঠছে

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে এক রোববার সকালে চাক পিয়াল আমেরিকার এক ইমার্জেন্সি ঘরে শুয়ে আছেন। ডাক্তাররা তাঁর রোগলক্ষণ উপসর্গ বোঝবার মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছেন। পিয়াল, ৬১, এই জ্ঞান হারাচ্ছেন তো এই ফিরে পাচ্ছেন। রক্তচাপ সড়সড় করে নেমে আসছে; পটাশিয়াম-মাত্রা বাড়ছে চড়চড় করে; আর রক্তে শুগার স্বাভাবিক মাত্রার দশ গুণ উঠে গেছে। এক ডাক্তার মনে করলেন: এটা বোধহয় হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু মোটেই তা নয়। পিয়ালের শরীর নিজেই নিজের ওপর আক্রমণ হেনেছে। এটা পিয়ালের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া; এক আপাত অত্যাশ্চর্য ক্যান্সার-চিকিৎসার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া।

আগের সাত সপ্তাহ ধরে ডাক্তাররা পিয়ালের মেলানোমা-র সঙ্গে লড়াই করছিলেন এ-সময়ের ক্যান্সার চিকিৎসার দু-টি সাড়া জাগানো ওষুধ দিয়ে। এরা শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে চাগিয়ে দেয় যাতে তা ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়ার হুমকির সামনে যেমন, তেমনি ক্যান্সারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বলা হচ্ছে, এইসব ইমিউনোথেরাপি ওষুধগুলো ক্যান্সার-চিকিৎসায় যুগান্তকারী সফলতা এনে দিয়েছে। এর গবেষণায় বিলিয়ন ডলার ঢালা হচ্ছে। কিন্তু যত এগুলো ব্যবহার হচ্ছে, ডাক্তাররা এর ভয়ানক ঝুঁকির দিকগুলো দেখতে পাচ্ছেন; যার কারণে এই ওষুধগুলো কার্যকর হচ্ছে, সেই একই কারণে এগুলো ব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ছে। লাগাম-ছাড়া ইমিউন-ব্যবস্থা সুস্থ-সবল অপরিহার্য অঙ্গগুলোকে আক্রমণ করতে পারে—যার মধ্যে পড়ে অন্ত্র (নাড়িভুঁড়ি), যকৃৎ (লিভার), ফুসফুস, এমনকী কিডনি, অ্যাড্রিনাল ও পিটুইটারি গ্ল্যান্ডও। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা হৃদ্‌যন্ত্রকেও ধরে নেয়। ইয়েল-এর ডাক্তাররা মনে করেন, ইমিউনোথেরাপি এক নতুন ধরনের অ্যাকিউট-অনসেট ডায়াবেটিস-এর কারণ; তাঁরা অন্তত এরকম ১৭টি কেস পেয়েছেন। পিয়াল তাঁদের ভেতর একজন। গবেষণায় দেখা গেছে, এরকম কিছু কিছু ওষুধের বেলায় প্রায় ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। আর মিশ্র ওষুধের বেলায় অর্ধেক রোগীই প্রতিক্রিয়ার শিকার।

> ডাক্তাররা এর ভয়ানক ঝুঁকির দিকগুলো দেখতে পাচ্ছেন; যার কারণে এই ওষুধগুলো কার্যকর হচ্ছে, সেই একই কারণে এগুলো ব্যবহারের ঝুঁকি বাড়ছে।

আর একটি গবেষণা জানাচ্ছে, প্রায় ৩০ শতাংশ রোগী 'অদ্ভুত ধরনের বিরল ও অপ্রত্যাশিত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার' শিকার হচ্ছেন। যাদের এক-চতুর্থাংশে অবস্থা ভয়ানক খারাপ, কারও জীবননাশের আশঙ্কা, হাসপাতালে দিতে হয়েছে। কিছু রোগী মারা গেছেন।

পরিণামে, অঙ্কোলজিস্ট ও ইমিউনোলোজিস্টরা বলছেন, এই চিকিৎসা-ক্ষেত্রে নজরদারি বাড়াতে হবে কেননা এইসব ওষুধগুলোর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। তাঁরা বলেন, আরও গবেষণার দরকার—কোন ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হয় আর কীভাবেই-বা তার চিকিৎসা সম্ভব। লস অ্যাঞ্জেলস-এর ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ডা. জন টিমারম্যান বলেন: 'আমরা আগুন নিয়ে খেলছি।' সম্প্রতি ওঁর একজন রোগী পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন। ইমিউনোথেরাপি ওষুধ মহিলাটির ক্যান্সার একদম 'মিলিয়ে' দিয়েছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর সর্দি ও ফ্লু-র উপসর্গ দেখা দিল এবং প্রদাহের ফলে তিনি মারা গেলেন। টিমারম্যান যার বর্ণনা দিয়েছেন: ইমিউনিটি-ব্যবস্থায় যেন 'একটা দাঙ্গা' বেধে গেল, যেন-বা 'একটা বিপ্লব' ঘটে গেল।

এতসব সতর্কবাণী সত্ত্বেও চিকিৎসকদের বিপুল অংশ এইসব ওষুধ ব্যবহারের পক্ষে—কেননা যারা মরেই যেত, এর ফলে তারা প্রাণে বেঁচে যায়। ডায়াবেটিস বা হেপাটাইটিস-এর মোকাবিলা করে বেঁচে থাকা তো মরে যাওয়ার থেকে ভালো—ভাবনাটা অনেকটা এইরকম। বেশির ভাগ প্রতিক্রিয়ারই চিকিৎসা করা যায়। 'এই পশুর এরকমই স্বভাব', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত জেনার ইনস্টিটিউট-এর প্রফেসর ও ইমিউনোলজিস্ট মার্টিন বাখমান বলেন: 'আমি জানি না, কীভাবে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার হাত এড়ানো যাবে—আদতে এটাই তো আপনারা চেয়েছিলেন।' কেমোথেরাপিরও সাইড-এফেক্ট আছে। ইয়েল অঙ্কোলজিস্ট ডা. হ্যারিয়েট ক্লুগার ইমিউনোথেরাপিকে বেশিই পছন্দ করেন কেননা এটা অনবরত চিকিৎসা না-চালিয়ে ক্যান্সারকে পাকাপাকিভাবে আটকে দিতে পারে।

আরোগ্যলাভের দিকে বেশি করে ঝোঁকা সত্ত্বেও অঙ্কোলজিস্টরা এখন সাইড-এফেক্টের ওপরও নজরদারি চালাচ্ছেন। টিমারম্যান বলেন: তিনি রোগীদের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলো তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে চান। তিনি বলেন, 'যদি আগে জানতে পারতাম, কী ভয়ানক শক্তির বাঁধন খুলে দিয়েছি, তা হলে হয়তো ওঁকে বাঁচাতে পারতাম।'

তথ্যসূত্র: এনওয়াইটি নিউজসার্ভিস: *টাইমস অভ ইন্ডিয়া*, ৫ ডিসেম্বর ২০১৬। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

প্রচার

বিজ্ঞান অন্বেষক সংগঠন শব্দদূষণের বিরুদ্ধে নীচের যে ছোটো প্রচারমূলক বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* তার সঙ্গে সহমত

শব্দ দিয়ে জব্দ করবার কৌশল মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে

পৃথিবীর সব থেকে শব্দ দূষিত শহর হল টোকিয়ো। আর সেই শহরে বধির ও মানসিক অবসাদে মৃত্যুর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। আর এই বিশ্বায়নের সংস্কৃতি বহুজাতিকের হাত ধরে এখন আমাদের দেশে জাঁকিয়ে বসছে এই সব শব্দ হাঙর কুমিররা। আহুজা থেকে সোনি এরা তাদের বিশাল এবং বিকট শব্দযন্ত্র নিয়ে উপস্থিত পাড়ার ছোটো-বড়ো মাইকের দোকানে।

আপনি সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়িতে ফিরেছেন। একটু শান্তিতে ঘুমোবেন, তার কি জো আছ? ঢুপ-ঢুপ-ঢুপ করে বুক কাঁপানো প্রচণ্ড আওয়াজ কানের পর্দায় ঘা মেরে বেজে চলেছে। বাড়িতে বাস করা দায়। একটু আস্তে বাজালে হয় না—এই আবেদন আপনার। কাকা, পুজোর ক-দিন জানালা-দরজা বন্ধ করে কানে বালিশ চাপা দিয়ে শুয়ে থাকুন। আর হার্টের রোগী হলে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যান। আপনি ভদ্র সাধারণ মানুষ। পাড়ার কাউকে অনুরোধ করবেন, উনি বলবেন কয়েকটা দিন তো, একটু মানিয়ে নিন। তবে মা দুর্গা তো সবার জননী, তাহলে কিছু মানুষের এই ভয়ংকর আনন্দ কেন অপরের নিরানন্দ হবে?

হালিশহরের বকুল অধিকারীকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। তিনি এই শব্দ দানবের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আইন অনুযায়ী ৬০ থেকে ৯০ ডেসিবেলের বেশি মাইক বা বক্স বাজানো নিষিদ্ধ। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ১৯৯৩ সালের পৌর আইনের ৩৫০ নং ধারা অনুযায়ী পৌর এলাকায় শব্দবাজি, ডি.জে. এবং জোরে মাইক বাজানো সম্প্রতি নিষিদ্ধ করেছে চাকদহ পৌরসভা। আমাদের কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী, হালিশহর ও গয়েশপুর পৌরসভা বা অন্যান্য পঞ্চায়েত সমিতিদেরও এগিয়ে আসা উচিত। এটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের এবং জনসাধারণের স্বার্থেই কাজ।

এছাড়া এই শব্দের ফলে এই অঞ্চলের বহু মানুষ কানে কম শুনছেন (বধির হয়ে গিয়েছেন) এবং বহু শিশুর স্মৃতিভ্রম হচ্ছে। ডাউন সিনড্রোম শিশুর জন্ম হচ্ছে এই শব্দ দানবের ফলে। এছাড়া চোখ ও ত্বকের ক্ষতি, বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও হার্ট অ্যাটাকের মতো রোগ বেড়ে যাচ্ছে।

কানে শোনা যায় এই রকম যন্ত্র নিয়ে কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীগণ রাস্তায় নেমে পড়েছেন ডালা সাজিয়ে। এবার পুজোর উপহার হিসেবে কানে শোনবার যন্ত্র উপহার দেওয়া হচ্ছে প্রবীণদের।

তাই সকলের কাছে আবেদন—আসুন, শব্দ বাজি ও শব্দ দূষণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক রুখে দাঁড়াই। দাবি উঠুক শব্দ বাজি নয়, শব্দ দূষণ নয় শান্তি চাই।

প্রচারে—বিজ্ঞান অন্বেষক। (RNI No WBBEN/2003/11192), E.mail: 1. bijnandarbar1980 @gmail.com 2. ganabijnan@yahoo.co.in M:9474330092/9874778216/9433962227/03325876275 (date of publication : 04/10/2016) স্বাস্থ্যের বৃত্তে

বিজ্ঞান পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থাপত্র লেখার দাবি উঠছে। আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন—*স্বাস্থ্যের বৃত্তে* তা আলোচনার জন্য পাঠকদের সামনে হাজির করল।

বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থাপত্রের দাবি

বন্ধু,

সঠিক চিকিৎসাপত্রের জন্য আপনার চিকিৎসকের কাছে আপনাকেই দাবি রাখতে হবে, দাবি রাখুন:

১. যতটা সম্ভব জেনেরিক নামে ওষুধ লিখে দিন। এভাবে লিখলে রোগীর ওষুধের খরচ অনেক কম হবে। সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বেশিরভাগ চিকিৎসকই এটা অবহেলা করছেন।

২. ওষুধের নাম ইংরেজি বড়ো হরফে লিখে দিন (ওষুধ মিলিয়ে নিয়ে খাওয়ার সুযোগ হবে)।

৩. ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম বাংলায় লিখে দিন। (ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম নিজেই বুঝে নিতে পারবেন)।

৪. অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার নিয়ম ঘণ্টা অনুযায়ী উল্লেখ করবেন। (অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হওয়া অনেকটা আটকাবে)।

৫. ওষুধ, খাওয়ার আগে না পরে খেতে হবে তা নির্দিষ্ট করে লিখে দিন। (ওষুধের সঠিক প্রয়োগ এভাবেই হয়)।

৬. কী রোগ হয়েছে তা নির্ণয় করে, ইংরেজি বড়ো হরফে লিখে দেবেন। (রোগ নির্ণয় হলেই কম ওষুধে নিরাময় হয়, ফালতু ওষুধ খেতে হয় না)।

বন্ধু, বিষয়টা নিয়ে ভাবুন। অন্যকে ভাবান। সামর্থ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন।

ধন্যবাদান্তে,
বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যবৃন্দ
আলিপুরদুয়ার জংশন
যোগাযোগ-৯৭৪৯৩৯০৪৪৯ স্বাস্থ্যের বৃত্তে

বই পড়া

সাপের কামড় ও তার প্রতিকার

জনস্বাস্থ্য সহায়ক পুস্তিকা

প্রকাশক: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনস্টিটিউট অফ হেলথ্ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার (২০১৬)

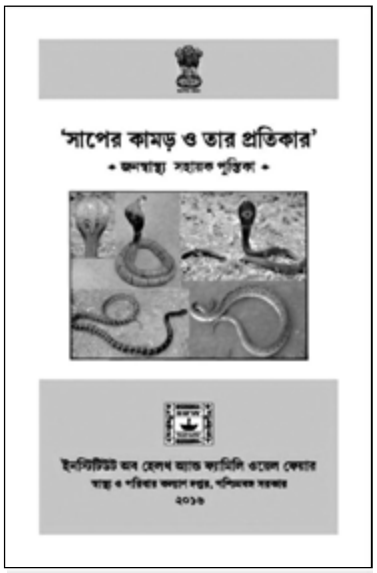

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনস্টিটিউট অফ হেলথ্ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ২০১৬) *সাপের কামড় ও তার প্রতিকার* বলে একটি সুন্দর জনস্বাস্থ্য সহায়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। সাপের কামড় এদেশে মূলত প্রান্তবাসী ও দরিদ্র জনসাধারণেব সমস্যা, তাই এটি কোনোদিন তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি। মেডিক্যাল কলেজের পাঠক্রম যেহেতু ইউরোপ-আমেরিকার ছাঁচে ঢালা, তাই সেখানে এটি একেবারেই অবহেলিত। সাপের কামড়ের চিকিৎসা সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ না জেনেও এমবিবিএস পাশ করা যায়। পাশ করার পর এদেশে ডাক্তারদের চিকিৎসা-জ্ঞান নিয়মিত নবীকরণের কোনো বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নেই। বড়ো বড়ো হোটেল-কনফারেন্স হলে ওষুধ কোম্পানির সহযোগিতায় খাদ্য পানীয় সহযোগে ডাক্তারদের নানা বিষয়ে অকাতর জ্ঞান বিতরণের অনুষ্ঠান হয়, সাপের কামড়ের চিকিৎসা নিয়ে সেখানে আলোচনা হয় না। এমনিতেই গ্রামে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল, আর সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের কামড়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকাই দস্তুর, তার ওপর গ্রামে গিয়ে সাপেকাটা রোগী পেলে এই প্রশিক্ষণবিহীন ডাক্তাররা হাতুড়েপনা শুরু করেন। অবশ্য এই অবস্থাটা আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে।

এমন অবস্থা বদলাতে গেলে নানা স্তরে উদ্যোগ দরকার। ডা. দয়ালবন্ধু মজুমদার, ডা. শুভজিৎ ভট্টাচার্য, তাঁদের নানা সহযোগী ও অন্য অনেকে সেই কাজটা বহুদিন ধরে করে চলেছেন। তারই একটা ফল হল আলোচ্য পুস্তিকাটি। বাংলায় লেখা ৪০ পাতার একটি ঝকঝকে বই, আলোচনায় মুনশিয়ানা ও ভাষার ওপর স্বাভাবিক দখল, অনেকগুলি সুন্দর ছবি, পুস্তিকার বিন্যাস ও অলংকরণে পারিপাট্য— সব মিলিয়ে এই কাজে নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের ওপর আমাদেব ভরসা বেড়ে গেল। বিষধর সাপ চেনা, সাপে কাটা সন্দেহ হলে সাধারণ মানুষের কী কী করা উচিত বা অনুচিত—এ সবই বইতে বিবৃত আছে। লেখা আছে বিষাক্ত সাপের কামড় মনে হলে ডাক্তারের কী করণীয়।

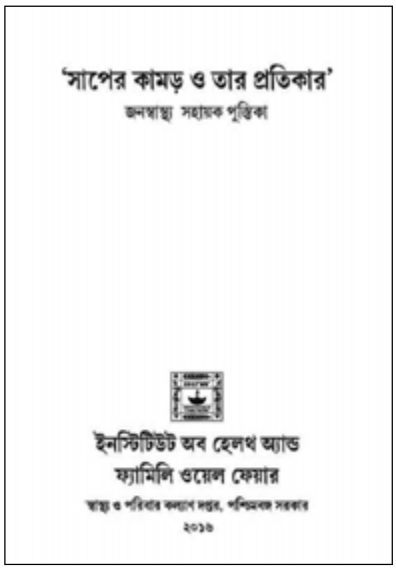

সাপের কামড়ের চিকিৎসার ধাপগুলো একটি ৬ ফুট বাই ৪ ফুট বোর্ডে 'ফ্লো চার্ট' হিসেবে সরকার বিলি করেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি হাসপাতালে এই 'ফ্লো চার্ট' সমেত বোর্ড সহজে দেখা যায় এমন জায়গায় রাখার সরকারি নির্দেশ রয়েছে— নির্দেশটি অবশ্য সর্বত্র পালিত হয় না।

কিন্তু এই পুস্তিকাটি যদি সত্যিই *জনস্বাস্থ্য সহায়ক পুস্তিকা হয়ে* উঠতে পারে, তবে তাকে মানুষের হাতে পৌঁছোতে হবে। মানুষ যদি সাপের কামড় বিষয়ে পুস্তিকাতে লেখা বৈজ্ঞানিক তথ্য জানতে পারেন, যদি জানতে পারেন সরকারি ব্যবস্থায় তাঁদের কী অধিকার রয়েছে, তাহলে মানুষের মধ্যে থেকেই দাবি উঠবে— এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যাকে অবহেলা করা চলবে না। কার্যকর চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও এদেশে বছরে ৩৫০০০-৪৫০০০ মানুষ প্রতি বছর সাপের কামড়ে মারা যান। সেই নিবারণযোগ্য মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য দরকার প্রকৃত অর্থে জাগ্রত জনমত।

সাপের কামড়ের চিকিৎসার ধাপগুলো একটি ৬ ফুট বাই ৪ ফুট বোর্ডে 'ফ্লো চার্ট' হিসেবে সরকার বিলি করেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি হাসপাতালে এই 'ফ্লো চার্ট' সমেত বোর্ড সহজে দেখা যায় এমন জায়গায় রাখার সরকারি নির্দেশ রয়েছে

আলোচ্য পুস্তিকাটি সেই দিকে এক বড়ো পদক্ষেপ। এটির বহুল প্রচার ও পাঠকের তরফে কার্যকর সাড়া—এ-দুটি হলে এই রাজ্যের সর্পাঘাত-চিকিৎসায় এক বড়ো সদর্থক পরিবর্তন সম্ভব। স্বাস্থ্যের বৃত্ত

পুস্তিকা সমালোচক জয়ন্ত দাস, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার সম্পাদক

চিঠি ১

প্রিয় সম্পাদকমণ্ডলী
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

ছোটো থেকেই আমি আমার অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার শিক্ষা পেয়েছি। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকাটি হাতে পাওয়ার পর থেকে পত্রিকাটিকে আমার জীবনে আর একজন অভিভাবকের আসনে বসিয়েছি।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে নিতে পারছি এবং পত্রিকাটি আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সহযোগিতা করছে। সব থেকে বড়ো কথা হল এই যে, পত্রিকাটি সহজ ও সরল বাংলা ভাষায় হওয়ায় আমার মতো সাধারণের পক্ষে খুবই সুবিধা হয়েছে।

সমাজসেবা নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে এবং সেই সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে 'হেলথ ম্যানেজমেন্ট', 'সাইকোলজি'-র মতো বিষয়গুলি নিয়ে নাড়াঘাঁটা করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যাঁদের কাছ থেকে বিষয়গুলি সম্বন্ধে জানতে হয়েছে তাঁরা কেউই চিকিৎসক নন। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকাটিতে চিকিৎসকরাই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি লিখছেন বলেই লেখাগুলি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। যা আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশীদেরও ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করছে।

পত্রিকার কিছু কিছু আলোচনা আমার পরিবারে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে, যার ফল খুবই ভালো। যেমন, ফ্যাটি লিভার সংক্রান্ত আলোচনা, স্বাস্থ্য সম্মত রান্না, মহিলাদের গর্ভধারণ সংক্রান্ত আলোচনা, গ্যাসের ব্যথা সংক্রান্ত আলোচনা ইত্যাদি। আমার বিবাহ পরবর্তী জীবনে দেখছি যে, উক্ত বিষয়গুলি পরিবারগুলিতে খুবই সেনসিটিভ। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* হাতে নিয়ে আমার পরিবার-পরিজনদের উক্ত বিষয়গুলি বোঝাতে কিছুটা হলেও সক্ষম হচ্ছি।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে আর একটি বিষয়ে সহযোগিতা করেছে। সেটি হল এই যে, পত্রিকাটি পড়ার পর থেকে বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে একটু একটু জানতে পারছি। তাই ভরসা করে এখন চিকিৎসকের কাছে গেলে সংশ্লিষ্ট রোগ সম্পর্কে প্রশ্ন করি, প্রশ্ন করি ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে অর্থাৎ ওষুধের উপকারিতা ও অপকারিতা উভয় দিক নিয়েই। ওয়াকিবহাল হই ওষুধ কোম্পানিগুলি সম্বন্ধে।

পত্রিকাটির পরিচালকদের কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাসা ও অনুরোধ, সেগুলি পরবর্তী সংখ্যায় আলোচিত হলে খুবই উপকৃত হই।

এক: পরিবারের মহিলাদের বিশেষত সধবা ও বিধবাদের নানান ধরনের উপোস যেগুলি তাঁদের নানান রোগের সম্মুখীন করছে। যার সঠিক চিকিৎসা তাঁরা করান না বা করানো হয়ও না। স্বামী ও পুত্রদের মঙ্গল কামনার জন্য উপোস করতে গিয়ে তাঁরা যে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, এর প্রতিকার কী? বর্তমানে অনেক পরিবারের পুরুষরা তাদের স্ত্রী ও মায়েদের এই বিষয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বোঝালেও মহিলারা আসার চেষ্টা করেন না বরং বিষয়গুলিকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেন। এমনকী উচ্চশিক্ষিত মহিলারাও এর থেকে বেরোতে চান না। আমার বক্তব্য এই যে, আমি যদি নিজে সুস্থ না থাকি তাহলে কী করে আমার পরিবারকে সুস্থ রাখব? পত্রিকার কাছে আমার অনুরোধ এই ঘুণপোকাটিকে কী করে সারানো যায়?

দুই: এই মুহূর্তে আমি একজন ভাবী-মা। আমার প্রশ্ন, অপারেশনের সময় কোমরে সুচ ফুটিয়ে অবশ করানোর নতুন পদ্ধতি (এর ডাক্তারি পরিভাষা আমার জানা নেই)—তার কতটা উপকারিতা রয়েছে? আমার পরিচিত অনেক মহিলার কাছ থেকে জেনেছি, এইভাবে অপারেশনের পর তারা বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে রান্না করতে পারেন না। বেশি ওঠা-বসা করতে পারেন না। আমি একজন নৃত্যশিল্পী, তাই বিষয়টি সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী। পরবর্তী সময়ে আমার নাচের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে কিনা জানতে চাই। উক্ত বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করলে খুবই উপকৃত হব।

তিন: চিকিৎসক ও রোগী—উভয়ের কাজের বিষয়টির উপর যদি আলোকপাত করা হয়। কারণ এরকম দেখেছি যে, রোগী চিকিৎসককে তার সংশ্লিষ্ট রোগ সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে চাইলে, অনেক চিকিৎসক উত্তর দিতে চান না, বিরক্ত হন এমনকী রেগেও যান। আবার উলটোদিকে, চিকিৎসক রোগীকে তার শারীরিক সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে রোগী স্পষ্টভাবে কিছুই বলেন না।

সবশেষে বলব যে, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* একটি অত্যন্ত ভালো প্রয়াস। এর প্রচার ও প্রসার যেন আরও বাড়ে। তাহলে আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী, নৃত্য শিল্পী, বিরাটি

শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* কেবল যে কিছু তথ্য সরবরাহ করেই তার ভূমিকা শেষ করছে না, রোগ-চিকিৎসা-চিকিৎসক-স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন তুলছে, এটা আমাদের বড়ো পাওনা।

শর্মিষ্ঠা তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন। প্রথমটি মহিলাদের ধর্মীয় কারণে উপবাস করানো নিয়ে। না, উপবাস করা ভালো নয়, কি মহিলাদের পক্ষে কি পুরুষদের পক্ষে। তবে এ নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* কোনো প্রবন্ধ এযাবৎ ছাপা হয়নি। কথা দিচ্ছি শিগগির এ ব্যাপারে প্রবন্ধ প্রকাশ করব।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হল, 'ভাবী-মা' হিসেবে অপারেশনের সময় কোমরে সুচ ফুটিয়ে অপারেশন করার নতুন পদ্ধতি কতটা নিরাপদ। ' অপারেশন' বলতে শর্মিষ্ঠা যদি সিজারিয়ান সেকশন-এর কথা বলেন, তাহলে এপিডুরাল অ্যানাস্থেশিয়ার কথা বলেছেন বোধহয়। এই পদ্ধতিতে অবেদন (অ্যানাস্থেশিয়া) মোটামুটি নিরাপদ। তবে স্বাভাবিক প্রসবের জন্যও প্রবল প্রসব-বেদনা সহ্য করার দরকার নেই—'এপিডুরাল অ্যাপালজেসিয়া' পদ্ধতিতে প্রসূতি মায়ের পিঠে একটি সরু ক্যাথেটার ঢুকিয়ে বেদনাহীন প্রসব (নর্মাল ডেলিভারি') সম্ভব হয়। এদেশে এর প্রচলন কম, কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের হাতে এটি খুবই নিরাপদ পদ্ধতি। এ নিয়ে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০০৩)-তে লিখেছেন ডা. সুব্রত রায় ('প্রসব যন্ত্রণায় অবেদন—সেকাল ও একাল')

শর্মিষ্ঠার তৃতীয় প্রশ্নটি অবশ্য ঠিক প্রশ্ন নয়, তিনি চেয়েছেন, 'ডাক্তার ও রোগী, উভয়ের কাজের বিষয়টির উপর যদি একটু আলোকপাত করা হয়।' এই পত্রিকায় অনেক লেখাতেই ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা এসেছে, এসেছে রোগীর জানবার অধিকার-এর কথা, ডাক্তারের কাছে রোগীর কথাগুলো স্পষ্ট করে বলার বিষয়। এ নিয়ে হয়তো আলাদা করে নিবন্ধও প্রকাশিত হবে, কিন্তু *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র বিভিন্ন রোগ-চিকিৎসা নিয়ে লেখাগুলি পড়লেই এ বিষয়ে আমাদের মূল বক্তব্যটি শর্মিষ্ঠা ধরতে পারবেন বলেই মনে হয়। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

চিঠি ২

সাধারণ কিছু অসুখ-বিসুখ—পাঠকের প্রতিক্রিয়া

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা ডা. পুণ্যব্রত গুণ-এর লেখা *সাধারণ কিছু অসুখবিসুখ* বইটি নিয়ে আলোচনা পড়ে সেই বইটি কিনে ফেলি। বইটি পড়ার পরে একজন পাশ না-করে গ্রামীণ চিকিৎসক হিসেবে আমার প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি।

সকাল ৭টায় ট্রেন। ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম *সাধারণ কিছু অসুখ-বিসুখ*—ডা. পুণ্যব্রত গুণের লেখা বইটি। তাড়াতাড়ি করে পৌঁছাতে হবে লবণ সত্যাগ্রহ স্টেশনে। যথাসময়ে উঠে পড়লাম। গন্তব্যস্থল আমাদের হাসপাতাল বাঁকুড়া। বইটি বের করলাম। পড়তে শুরু করলাম। পড়তে পড়তে কখন যে সময় পার হয়ে গেল তা বুঝতে পারিনি।

মনে প্রশ্ন জাগে, ভাবি এখনকার মোবাইলের যুগে কে-বা এই বই-পড়বে? কারও হাতে সময় নেই। কেউ যদি পড়েও কতটুকুই বা ব্যবহার করবে? বইটির লেখাগুলো অসাধারণ মাপের। এই বইয়ের অনেক কথাই আমি আগে কখনো শুনিনি, পড়িনি। এই ধরনের বই যদি আগে পেতাম তাহলে অনেক ভুল ধারণা থেকে মুক্তি পেতাম।

ভাবি এখনকার মোবাইলের যুগে কে-বা এই বই-পড়বে? কারও হাতে সময় নেই। কেউ যদি পড়েও কতটুকুই বা ব্যবহার করবে? এই বইয়ের অনেক কথাই আমি আগে কখনো শুনিনি, পড়িনি। এই ধরনের বই যদি আগে পেতাম তাহলে অনেক ভুল ধারণা থেকে মুক্তি পেতাম।

বইটি যদি সাধারণ মানুষ, পাশকরা ডাক্তার, পাশ-না করা গ্রামীণ চিকিৎসক-এর কাছে পৌঁছায় তাহলে লেখকের লেখা সার্থক হয়ে উঠবে। বিশেষ করে পাশ-না-করা ডাক্তারদের অনেক অজানাকে জানতে, বুঝতে এবং রোগ নির্ণয় করতে সুবিধা হবে।

গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ ডাক্তারবাবু (পাশকরা ও পাশ-না করা) গতানুগতিক চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকেন। আগের দিনের চিকিৎসা এবং এখনকার দিনের আধুনিক চিকিৎসায় অনেক ফারাক। তাই এই বই পড়লে অনেক শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে, এবং চিকিৎসা দেওয়াটা সহজতর হবে।

লেখক তার লেখার বিষয়বস্তুগুলিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখক লেখার ধরন, বিষয়নিষ্ঠতা এবং প্রতিটি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেখার ভাষা ও শব্দের ব্যবহার খুবই সহজ, যা পাঠকরা সুন্দরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। কতগুলো উদাহরণ দিই।

আগে জানতে পারিনি ভারতে শিশুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিউমোনিয়ার পরেই ডায়রিয়ার স্থান, আর দুটো রোগ মিলে ৪০ শতাংশ শিশুর প্রাণ অকালে হরণ করে। বমির সমস্যা বেশি জটিল, চিকিৎসাও জটিল হতে পারে—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরল চিকিৎসা কার্যকর। ভারতে প্রায় ২০ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ অঙ্কুশ কৃমির সংক্রমণে ভোগে, এটাও জানা ছিল না। আরও জানতে পারি আলসার মানে গভীর ক্ষত ও ইরোশান মানে অগভীর ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্যের অন্যতম প্রধান কারণ আই বি এস (Irritable bowel syndrome); রক্তাল্পতায় কারণ না জেনে ভিটামিন বি$_{১২}$ দেওয়া অযৌক্তিক ইত্যাদি। আমিও চাই সকলের জন্য শুধু শিক্ষা নয়; চাই স্বাস্থ্যও। যে দেশের অধিকাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার কম তাদের কাছে এই বইটি পৌঁছানো দুষ্কর ব্যাপার। আর তারা মানসিকভাবেও প্রস্তুত থাকবে না পড়ার জন্য, এটাই দুঃখের।

বইটি পড়ে মনে হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে লিখলে ভালো হত। যেমন ডায়রিয়া কীভাবে হয় তার বিশ্লেষণ করা, ADH হরমোন-এর উল্লেখ করা, কারণ এই হরমোনের কাজ কিডনি থেকে জলকে পুনঃশোষণ করা যেটার ডায়রিয়ার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে। জলশূন্যতা হলে স্যালাইন কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা দরকার বলে মনে করি। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে বেশি ছিবড়ে যুক্ত খাবার ও জল খেতে হবে প্রচুর—লেখক বলেছেন। এখানে ছিবড়ে, polysacharide, জল, শর্করা বিষয়ে আর একটু বেশি লেখা দরকার আছে বলে মনে করি।

রক্তরসে থাকে জল খনিজ পদার্থ আর কয়েকপ্রকার প্রোটিন— লেখা হয়েছে। প্রশ্ন মনে জাগে, কোন প্রোটিনের কী কাজ? তাদের নামগুলি কী কী? আবার, ফেরাস সালফেটের সঙ্গে ফলিক অ্যাসিড খাওয়ানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সাধারণ পাঠকরা বুঝতে পারলে অনেক অযৌক্তিক আয়রন মিশ্রণ ঔষধ বাজার থেকে কম বিক্রি হত।

ডায়াবেটিস রোগীর খাবারদাবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা দরকার—এখানে যদিও লেখক উল্লেখ করে গেছেন। ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন, কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড, ইউরিক অ্যাসিড সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। লেখক এগুলি নিয়ে আরেকটু বিস্তৃতভাবে লিখলে ভালো হত। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত।

ভবিষ্যতে যদি আবার নতুন সংস্করণ হয় তাহলে আরও কিছু বিষয়ে

আগে জানতে পারিনি ভারতে শিশুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিউমোনিয়ার পরেই ডায়রিয়ার স্থান, আর দুটো রোগ মিলে ৪০ শতাংশ শিশুর প্রাণ অকালে হরণ করে। বমির সমস্যা বেশি জটিল, চিকিৎসাও জটিল হতে পারে—কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরল চিকিৎসা কার্যকর।

যেমন মানসিক রোগ, দাঁত, চামড়ার রোগ, ব্যায়াম, মেয়েদের রোগ, হরমোন নিয়ে আলোচনা সংযোজন করলে পাঠকদের কাছে এই বইটির গ্রহণযোগ্যতা অনেকগুণ বেড়ে যাবে বলে মনে করি। বইয়ের সেই বর্ধিত নব সংস্করণেব আশায় থাকলাম।

অশোক কুমার গিরি, গ্রামীণ চিকিৎসক। স্বাস্থ্যের বৃত্তে

চিঠি ৩

দু-একটা কথা বলতে চাই

স্বাস্থ্যের বৃত্তে একটা দরকারি পত্রিকা। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা অজানাকে (স্বাস্থ্য সংক্রান্ত) সামনে হাজির করে সচেতন করে দেয়। যেমন, শরীর একটু খারাপ হলেই আমরা ওষুধের দোকান থেকে বা ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে মুড়িমুড়কির মতো যেসব ওষুধ এনে খাই তাদের মধ্যে কোনগুলো মারাত্মক ক্ষতিকারক, কোনগুলো নয় ইত্যাদি।

আমি *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র একজন গ্রাহক, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, একনিষ্ঠ পাঠক নই। কারণ *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র একটা 'অতিরিক্ত' গাম্ভীর্যের স্বর আছে, হয়তো সেটাই আমাকে পত্রিকার খুব গভীরে ঢুকতে দেয় না। মনে হয়, ইশকুল-বেলা পেরিয়ে এসে আবার সেই 'পাঠ্যপুস্তক'-এর কচকচি। আরও একটু 'সহজ' ভাব এলে আমার মনে হয় ভালো হবে। যেমন, ভাবতে ভাবতে মনে হল, কার্টুন মানুষের মনে খুব সহজে ঢুকতে পারে। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানান 'সু' আর 'কু' নিয়ে ছোট্ট করে যদি একটা 'কার্টুন স্ট্রিপ' শুরু করা যায় তাহলে বিষয়টা আরও 'মনকাড়া' হতে পারে। এ ছাড়া নিয়মিত বিভাগ 'শব্দছক' তো আছেই। বেশির ভাগ সাদাকালো ছবির মান একেবারেই ভালো নয়। কী বলতে চাওয়া হচ্ছে সেটা ছবি দেখে বোঝা খুব শক্ত। এই বিষয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অনমিত্র রায়, কবি ও সম্পাদক, হাওড়া

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

চিঠি ৪

প্রিয় সম্পাদক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে প্রকাশনার জন্য বিজ্ঞাপন নিচ্ছেন না এটা মানতে পারলাম না। পরিচালকমণ্ডলীর অধিকার ১০০% আছে পত্রিকা চালানোর জন্য, কিন্তু আমাদের মতো পাঠকের কিছু অধিকার আছে বলার। চেঙ্গাইল ক্লিনিক থেকে বছরে ৪৮,০০০ টাকা বিজ্ঞাপন বাবদ না নিয়ে পত্রিকায় অন্য বিজ্ঞাপন নিয়ে যদি চেঙ্গাইল ক্লিনিককে উলটে বিজ্ঞাপন লব্ধ অর্থ দিয়ে আরও সমৃদ্ধ ও উন্নত করা যেত তবে তা সাধারণ মানুষের আরও উপকার হত। যদি ভাবাই যায় চেঙ্গাইল শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগকে একটি হাসপাতালে উন্নীত করব তাহলে ওষুধ কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিয়ে পাপবোধ জন্মাবে না। এক্ষেত্রে শেরউড বনের রবিনহুডের কথা মনে করা যেতে পারে।

আশীষ সাহা, নবদ্বীপ স্বাস্থ্যের বৃত্তে

Advt.

মিডিয়া কবলমুক্ত, তথ্যনিষ্ঠ বিশ্ব-বিশ্লেষণের ত্রৈমাসিক সম্ভার

বাংলা মান্থলি রিভিয়ু

স্বাধীন মার্কসবাদ-চর্চার অনন্য পত্রিকা

যোগাযোগ: বই-চিত্র, কলেজস্ট্রিট, কফি হাউস, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুঠোফোন: ৯৪৭৭৪৩৩৩৫২
৯৮৩০৮৪৭১৫৯

শব্দ ছক

প্রস্তুতি: রুচিরা মজুমদার

✠	✠	১	✠	✠	২		✠	✠	৩	
✠	৪			৫		✠	৬			✠
৭			✠		✠	৮		✠	✠	✠
✠		✠	✠	৯	১০	✠	১১		✠	✠
১২		✠	১৩			১৪		✠	১৫	
✠		✠	১৬		✠		✠	✠		✠
১৭			✠	✠	✠		✠	১৮		
✠	✠	✠	১৯		২০		✠	✠		✠
২১	✠	২২		✠		✠	২৩	✠	২৪	
২৫	২৬			✠	✠	২৭				✠
✠		✠	২৯				✠		✠	✠

সূত্র:

পাশাপাশি: ২. অনেকে এর সাদা অংশটুকু খান ৩. _____ কার্ডিয়োগ্রাম ৪. মুরগি-বসন্ত ৬. এই অসুখে মাথা ঘোরে ৭. ভিটামিন ডি-এর অভাবে হয় ৮. মানসিক রোগীদের এটা হতে পারে ৯. এটা বাজাতে হলে ঠোঁট গোল করতে হবে ১১. খাদ্যশস্য ১২. মশার কামড়ে হতে পারে ১৩. রক্তে চিনি বেশি হলে ১৫. এরপরে জাইম বসালে হজম হয়ে যাবে ১৬. ভাইরাসঘটিত অসুখ ১৭. এটা রোজই করা ভালো ১৮. কিডনির কাজ ১৯. সায়নাসাইটিস যেখানে হয় ২২. এর থেকে প্রোটিন মেলে ২৪. টাকার মতো এও ব্যাঙ্কে পাওয়া যায় ২৫. জন্মনিরোধক ২৭. স্থূলত্ব ২৯. এই ফোঁড়ার একটা মুখ নয়।

উপর নিচ: ১. বল ও _____জয়েন্ট ২. পরে_____রে বসালে পাওয়া যাবে হাড়ের ছবি ৩. এটা বাড়লে মুশকিল ৪. এই অসুখের শুরুতেও মুরগি ৫. শরীরে এই খনিজ দরকার ৬. অনেক অসুখের কারণ ১০. যক্ষ্মা ১৩. মিথ্যে বা ফেল-এর আগে বসে ১৪. কেটে গেলে এটা তাড়াতাড়ি নেওয়া হয় ১৫. হরমোন প্রতিস্থাপন ১৯. যন্ত্রণাদায়ক ২০. নাক দিয়ে রক্ত পড়া ২১. এই ঢেঁকুর ওঠে 'অ্যাসিড' হলে ২২. ঘন দুধের ওপর দেখা যায় ২৩. পরে দা বসালে ফল ২৬. তামাক ও এটা কম খান ২৭. _____ খেও না, ধরবে গলা ২৮. স্ক্যান।

সমাধান ১৫ পাতায়।

Advt.

সবার জন্য স্বাস্থ্য সম্ভব?

কেন্দ্র সরকার কমিটি বলছে

সম্ভব

সরকার বলছে

অসম্ভব

আমরা বলছি

সবার জন্য স্বাস্থ্য চাই

আপনি?

'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রচার কমিটি